ছোটদের শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প

ছোটদের
শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প

সুজিতকুমার নাগ
সম্পাদিত

নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

উপহার

....

....

....

সূচীপত্র

———

কাঁচায় পাকায়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাদশার আগাগোড়া পাকা দাড়ির মাঝে একটিমাত্র কাঁচা ও বেগমের সব কাঁচা চুলের মধ্যে একটি পাকা চুল দেখা যায়। বেগমের কিছুতেই পছন্দ হয় না বাদশার দাড়ি—তা যতই কেন বাদশা আতর কস্তুরীতে দাড়ি মাজুন। ওদিকে বেগমসাহেবা—তিনিও মাথায় হীরে-মুক্তোর ঝাপটা সিঁথি পরেও সেই একগাছি পাকা চুল বাদশার চোখ থেকে ঢেকে রাখতে পারেন না। দু'জনে দু'জনকে দেখে মুখ ফেরান, দু'জনেই মনের দুঃখে থাকেন। শেষে এমন হল, যে বাদশার দরবারে কাঁচা-দাড়ি এবং বেগমের দরবারে পাকা চুল যাদের, তাদের টেকাই দায় হল।

কবি আসে, কালোয়াত আসে, ছবিওয়ালী আসে, চুড়ীওয়ালী আসে, কেউ খাতির পায় না, উল্টে বরং ধমক খায়, গর্দান যায়, সরে পড়ে প্রাণ নিয়ে।

উজির ভেবেই অস্থির—কি করা যায়। নাপিত-নাপ্তিনীকে উজির ডেকে বলেন, 'তোরা সাঁড়াশি দিয়ে চুল-দু'গাছা উপড়ে দে, আপদ চুকুক।'

তারা ভয়ে শিউরে উঠে বলে, 'দোহাই উজির সাহেব, এমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না সাঁড়াশি দিয়ে আমাদের দাঁত উপড়ে ফেলতে বলেন তো পারি, বাদশা বেগমের উপর অস্তর চালাই এমন নেমক হারাম আমরা নই।'

উজির নিশ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে বসেন। কি উপায়।

মোল্লা দো-পেঁয়াজা পেঁয়াজ-রসুন খেতে বড়ই ভালবাসেন, কিন্তু হাতে পয়সা নেই মাষকলাই কেনবারও। ফতোয়া দেন মসজিদে তু'বেলা ; কোন ফল হয় না। তাঁর বিবি তাঁকে বলেন, 'দেখ এই সময় বাদশা-বেগমের খুশি করতে পার তো কিছু হতে পারে।'

মোল্লা বললেন, 'তা জানি, পেঁয়াজও হতে পারে পয়জারও হতে পারে।'

বিবি বললেন, 'দেখ না চেষ্টা করে : কিছু না হওয়ার চেয়ে সে-ও যে ভাল।'

মোল্লা সকালে কোমর বেঁধে মজলিসে হাজির। দেখেন সবাই যে যার দাড়ি মোচড়াচ্ছেন আর চুপ করে বসে আছেন। এমনকি যার দাড়ি-গোঁফ কিছুই নেই সেও হাত বোলাচ্ছে শুধু গালের ওপরটাতেই। নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদ সব বন্ধ।

বাদশা মোল্লার দিকে চাইতেই মোল্লা মস্ত এক সেলাম ঠুকলেন, কিন্তু বাদশার উচ্চবাচ্য নেই। তখন মোল্লা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে যেভাবে ফতোয়া দেয় লোকে, সেইভাবে সুর করে গান সুরু করলেন দাড়ি নেড়ে—

আব্ দাড়ি চাপ দাড়ি,
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি,
কুল পাক্কা এক কাঁচ্চা
ওহি দাড়ি সব্ সে আচ্ছা।

বাদশা খুশী হয়ে তালে তালে ঘাড় নাড়ছেন দেখে মোল্লা আবার গাইলেন—

এক দাড়ি মান মনোহর
এক দাড়ি ভাবেবা।
এক দাড়ি খালিফ ফজিহৎ
এক দাড়ি ঠচ্ ঢো।

সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সবসে আচ্ছা।

শুনে শুনে বাদশা একগাল হেসে ফেললেন, সেই সময় অন্দরেও হাসির রোল উঠলো, পর্দার আড়ালে।

এক সঙ্গে বাদশা বেগম আমির ওমরা এবং শহরের কাঁচা পাকা যে কেউ খুশি হয়ে গেল। মোল্লার প্যাঁজ-রসুন ধরে না ঘরে। শহরের বাড়ি বাড়ি দাড়ির গান উল্টে-পাল্টে লোকে গাইতে থাকলো, যার যেমন খুশি সুরে।

প্রীতিভোজ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

গৃহস্থের ঘরের কোণে হাঁড়ি ঝোলানো ছিল, তার ভিতরে চড়াই-চড়নী থাকত। একদিন চড়াই বললে, 'চড়নী আমি পিঠে খাব।' চড়াই বললে, 'পিঠের জিনিস-পত্র এনে দাও, গড়ে দেব এখন।'

চড়াই বললে, 'কি জিনিস লাগবে ?'

চড়নী বললে, 'ময়দা লাগবে, গুড় লাগবে, কলা লাগবে, দুধ লাগবে, কাঠ লাগবে।'

চড়াই বললে, 'আচ্ছা আমি সব এনে দিচ্ছি।' বলে সে বনের ভিতরে গিয়ে, গাছের সরু-সরু শুকনো ডাল মট-মট করে ভাঙতে লাগল।

সেই বনের ভিতর এক মস্ত বাঘ ছিল, সে চড়াইকে বলত বন্ধু। ডাল ভাঙার শব্দ শুনে সে বললে, 'মট-মট করে ডাল ভাঙছে, ওকি আমার বন্ধু ?'

চড়াই বললে, 'হ্যাঁ, বন্ধু।'

বাঘ বললে, 'ডাল দিয়ে কি হবে ?'

চড়াই বললে, 'কাঠ চাই, চড়নী পিঠে গড়বেন।'

শুনে বাঘ বললে, 'আমি কখনো পিঠে খাইনি। আমাকে দিতে হবে।'

চড়াই বললে, 'তবে যোগাড় করে সব এনে দাও।'

বাঘ বললে, 'কি কি যোগাড় চাই ?'

চড়াই বললে, 'ময়দা চাই, গুড় চাই, দুধ চাই, ঘি চাই, হাঁড়ি চাই, কাঠ চাই।'

বাঘ বললে, 'আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি সব এনে দিচ্ছি।'

চড়াই তখন ঘরে এল, আর বাঘ দুলতে দুলতে বাজারে চলল। বাজার গিয়ে বাঘ খালি একটিবার বললে, হাল্লুম। অমনি দোকানীরা, বাবা গো! বাঘ এসেছে গো! পালা! পালা! বলে দোকান-টোকান সব ফেলে ছুটে পালাল। তখন বাঘ সব দোকান খুঁজে ময়দা, গুড়, কলা, দুধ, ঘি, হাঁড়ি আর কাঠ নিয়ে চড়াইয়ের বাড়ীতে দিয়ে এল।

তারপর চড়নী চমৎকার পিঠে গড়ল, আর দু'জনে মিলে পেট ভরে খেল। শেষে বাঘের জন্য একখানা পাতায় করে কতকগুলি মাটিতে রেখে দিয়ে, দু'জনে চুপ করে হাঁড়ির ভিতর বসে রইল।

বাঘ এসে পিঠে দেখতে পেয়েই খেতে বসে গেল।

একখানা পিঠে মুখে দিয়ে সে বললে, 'বাঃ—! কি চমৎকার!'

আর একখানা মুখে দিয়ে বললে, 'না, এটা তো ভাল নয়, খালি খালি ময়দা দিয়ে গড়েছে।'

আর একখানা মুখে দিয়ে বললে, 'ছিঃ এটাতে ভুষি আর ছাই!'

আর একখানি মুখে দিয়ে বললে, 'উঃ হুঁ! এটাতে কিসের গন্ধ। গোবর দিয়েছে নাকি? চড়াই বেটা তো বড় পাজী।'

এমন সময় হয়েছে কি, চড়াই হাঁড়ির ভেতর থেকে নাক-মুখ সিঁটকিয়ে বলছে, 'চড়নী আমি হাঁচব?' শুনে চড়নী বললে, 'চুপ চুপ! এখন হাঁচতে হবে না, তাহলে বড় মুশকিল হবে।'

চড়াই চুপ করল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার ভয়ানক হাঁচতে গেল। চড়নী তাকে থামাতে কত চেষ্টা করল, কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারল না।

বাঘ একটা বিশ্রী পিঠে খেয়ে বললে, 'থু! থু! এটা খালি

গোবর দিয়েই গড়েছে। আর কিছু দেয়নি। যদি চড়াইয়ের নাগাল পাই, তাকে কামড়িয়ে চিবিয়ে খাব।'

তারপর আর একটা পিঠে নিয়ে মুখে দিয়ে সে সবে ওয়াক্ ওয়াক্ করতে লেগেছে, অমনি হ্যাঁচ্ছোঃ করে চড়াই ভয়ানক শব্দে হেঁচে ফেললে। সে শব্দে বাঘ যেন চমকে লাফিয়ে উঠতে যাবে, অমনি হাঁড়িসুদ্ধ দড়ি ছিঁড়ে চড়াই আর চড়নী তার ঘাড়ে পড়ল।

বাঘ কিছু বুঝতে পারলে না, কি বাজ পড়ল, না আকাশ ভেঙে পড়ল। সে খুব ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে সেখান থেকে ছুট দিল, আর তার ঘরে না গিয়ে থামলো না।

চীনে পটকা

সুকুমার রায়

আমাদের রামপদ তাহার জন্মদিনে এক হাঁড়ি মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল। টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র, আমরা সকলেই মহা উৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল পাগলা দাশু।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালবাসে না, তা নয়। কিন্তু রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না, দু'জনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলত। আমরা রামপদকে বলিলাম, 'দাশুকে কিছু দে।' রামপদ বলিল, 'কিরে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল আর আমার সঙ্গে কোনদিন লাগতে আসবিনে তা হলে মিহিদানা পাবি।' এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবারই কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তারপর দারোয়ানের ছাগলটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিয়া মুচকি-মুচকি হাসিতে হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল।

টিফিনের পর ক্লাসে আসিয়া দেখি দাশু অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে এককোণে বসিয়া আপন মনে অঙ্ক কষিতেছে। তখনই আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিরে দাশু, কিছু

করেছিস নাকি?' নিতান্ত ভাল মানুষের মতো দাশু বলিল, 'হ্যাঁ, দুটো জি, সি, এম, করে ফেলেছি।' আমি বললাম, 'দুৎ! সে কথা কে বলছে? কিছু দুষ্টুমির মতলব করিসনি তো?' সে এ কথায় ভয়ানক চটিয়া গেল। তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে আসিতেছিলেন— দাশু তাঁহার কাছে নালিশ করে আর কি! আমরা অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিলাম।

পণ্ডিত মহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য প্রায়ই কোন তাড়াহুড়ো করেন না। কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশী গোল করিলে হঠাৎ সাংঘাতিক রকম চটিয়া যান। পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই 'নদী শব্দের রূপ কর' বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া হড়বড় করিয়া যা-তা খানিকটা বলিয়া গেলাম এবং উত্তরে, পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে অতি সুন্দর ঘড় ঘড় শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও শ্লেট লইয়া 'কাটকুট' খেলা শুরু করিলাম। কেবল মাঝে মাঝে যখন ঘড়ঘড়ানি কমিয়া আসিত তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া 'নদী নদ্যৌ' ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের মতো খুব আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

সকলে খেলায় মত্ত, কেবল দাশু এক কোণায় বসিয়া কি যেন করিতেছে সেদিকে আমাদের খেয়াল নাই। একটু বাদে পণ্ডিত মহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নিচ হইতে ফট্ করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পণ্ডিত মহাশয় ঘুমের ঘোরে সবেমাত্র 'উঃ' বলিয়া কি যেন ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময় ফট্ফাট্ দুমদাম ধুপ্ধাপ শব্দে তাণ্ডব কোলাহল উঠিয়া সমস্ত স্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন যত রাজ্যের মিস্ত্রী মজুর সবাই একজোটে বিকটতালে ছাত পিটাইতে লাগিয়াছে, দুনিয়ার যত কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়া হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আমরা হাঁ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় একবার মাত্র বিকট শব্দ করিয়া

তারপর হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া এক লাফে টেবিল ডিঙ্গাইয়া একেবারে ক্লাসের মাঝখানে ধড়ফড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। পাশের ঘরে নিচের ক্লাসের ছেলেরা চিৎকার করিয়া নামতা আওড়াইতেছিল তারাও হঠাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে স্কুলময় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। দারোয়ানের কুকুরটা পর্যন্ত যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া বিকট কেঁউ কেঁউ শব্দে গোলমালের মাত্রা ভীষণ রকম বাড়াইয়া তুলিল।

মিনিট পাঁচেক ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিল তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।' দারোয়ানজি একটা লম্বা বাঁশ দিয়া অতি সাবধানে আস্তে আস্তে, তক্তার নিচ হইতে একটি হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল—রামপদর সেই হাঁড়িটা, তখনও তাহার মুখের কাছে একটুখানি মিহিদানা লাগিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ানক ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'এ হাঁড়ি কার?' রামপদ বলিল, 'আজ্ঞে আমার।' আর কোথা যায় অমনি দুই কানে দুই পাক। 'হাঁড়িতে কি রেখেছিলি।' রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে, গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে। সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল, 'আজ্ঞে ওর মধ্যে মিহিদানা এনেছিলাম' তারপর—মুখের কথা শেষ না হইতেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'তারপর মিহিদানাগুলি চীনে পটকা হয়ে ফুটতে লাগল, না?' বলিয়াই ঠাস্-ঠাস্ করিয়া দুই চড়।

অন্যান্য মাষ্টারেরাও ক্লাসে আসিয়া জড় হইয়াছিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনাদোষে রামপদ বেচারা মার খায় বুঝি। এমন সময় দাশু আমার শ্লেটখানা পণ্ডিত মশাইকে দেখাইয়া বলিল, 'এই দেখুন, আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন ওরা শ্লেট নিয়ে কাটাকুটি খেলছিল।' শ্লেটের উপর আমার নাম লেখা। পণ্ডিত মহাশয় আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর দাশুর দিকে কট্‌মট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, 'চোপরাও, কে বলেছে আমি ঘুমোচ্ছিলাম? ওরা সব খেলা কচ্ছিল? আর তুমি কি কচ্ছিলে?'

দাশু অম্লানবদনে বলিল, 'আমি পটকায় আগুন দিচ্ছিলাম।' সকলের চক্ষু স্থির। ছোকরা বলে কি।

প্রায় আধমিনিট খানেক কাহারও মুখে আর কথা নাই। তারপর পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ একেবারে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, 'কেন পটকায় আগুন দিচ্ছিলে?' দাশু ভয় পাইবার ছেলেই নয়, সে রামপদকে দেখাইয়া বলিল, 'ও কেন আমায় মিহিদানা দিতে চাচ্ছিল না?' রামপদ বলিল, 'আমার মিহিদানা, আমি যা ইচ্ছা তাই করব।' দাশু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, 'তাহলে আমার পটকা আমিও যা ইচ্ছা তাই করব।' এরূপ পাগলের সঙ্গে আর তর্ক করা চলে না। কাজেই মাষ্টারেরা সকলেই কিছু-কিছু ধমক-ধামক করিয়া যে যার ক্লাসে চলিয়া গেলেন। সে 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোন শাস্তি হইল না।

ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল, 'আমার পটকা রামপদর হাঁড়ি। যদি আমার দোষ হয়, তাহলে রামপদরও দোষ হয়েছে, ব্যাস্।'

কাজল জল

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক

সে এক রাখাল।

রাখালী করে মাঠে। গাই চরায়, আর বাঁশী বাজায়। কাকের চোখ নদীর জলের কালো সোঁত থমকে যায়, লাখে লাখে ঢেউয়ের ফণা তুলে সেই বাঁশী শোনে কাজল জল নদী আর দুলে দুলে, আ—স্তে বয়। দু'পাড়ে—কল্ কল্, ছল্ ছল্।

নদীর পাড়ে বটপাকুড়ের ছায়া বাঁশীর সুরের মৌচাক হয়ে থাকে। পাখীরা চুপ। মাঠের ঘাস চুপ। নদীতে পাল-তোলা-নৌকো চুপ। ময়ূরপঙ্খী চুপ। সওদাগরের ভরা চুপ।

কখন ঘাট ছাড়িয়ে ঢেউয়ের মাতন—নিয়ে যায় কোথায়, যারা থাকে কাজল জলে, তারা কেউ জানে না।

বাঁশী রাখালের···বাজে বটপাকুড়ের তলে।

দুই

বাজে বাঁশী।

শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়।

বাজ্‌তো আর বাজ্‌ছে না, গন্ধে কেন ভরে উঠে বাঁশীর সুর আর বাঁশীর বুক? না তো, গন্ধ ঘাট ছায় মাঠ ছায়, বট-অশথের পাতা ছায়,

নদীর বাতাস ছেয়ে যায়। রাখালের বাঁশীর ফুঁ চমকে যায় নেমে—

কিসের গন্ধ?

হঠাৎ থামিয়ে বাঁশী, চেয়ে রাখাল দেখে, এক যে আসছে আর ভাসছে ফুলের মালা, নদীর ঢেউয়ে, তেমন ফুল কখনোই কেউ দেখেনি।

কোথায় ঘাসের ফুল, কোথায় গাছের ফুল, কোথায় খাল, বিল, শহর, নদী, সাত সরোবরের ফুল, কোনই ফুল তার কাছে লাগে না।

বাঁশী নামিয়ে ধরে রাখাল দেখতে লাগল।

খৈ-ফোটা ঢেউ সোনায় সোনায় সোনালী হয়ে গেছে সেই ফুলের পাপড়িতে ঢেউয়ের দোলা নাচিয়ে, রোদের ঝলক হাসিয়ে মালা এসে ঠেকল বালির চড়ায়, যেন বালির দেশে কোন্ গন্ধ পাখীর সোনার ঝাঁক এসে বসল।

দেখলে কতক্ষণ রাখাল, গন্ধে 'ম' হয়ে, দেখলে 'থ' হয়ে। তার পরে কিনারে এসে নুয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে বাঁশীর আগায় করে তুলে নিলে মালাগাছা।

নদীর গন্ধ জল, বাতাস গন্ধে উছল। আর গন্ধে উতল রাখাল নাচ্‌ন পায়ে পাড়ে উঠে, বটের এক কচি ডালে মালাটি দোল্‌-দোল্ দুলিয়ে রেখে, বসল।

বসে আবার দিলে বাঁশীতে ফুঁ।

রাখালের গাই চরে গন্ধ ছম্‌ছম্ মাঠে। রাখাল বাঁশী বাজায়।

তিন

পরদিন ভোর আকাশের রাঙা বৌ যখন ঘোম্‌টা খোলেনি, সেই পোহাব পোহাব রাতে, চমকে মা বললে রাখালকে জাগিয়ে দিয়ে, 'মাণিক! কি মালা তুই আনলি, গন্ধে চোখে নেই ঘুম, সারা রাত পোহালে গাইয়ের সাড়া পাই—কপিলা, নীলা, ধবলী আর তিলকী কাজলী ঘুমোয়নি তো কেউ।'

ঘুম ভাঙা চোখে ঝুলনো মালায় রেখে, রাখাল বললে, 'কেন মা ?'

দেখে, সোনালী মালা শুকিয়ে, পাপড়ি পাতা লুকিয়ে, কোঁচনো গুছনো ঝুলছে ; নেই গন্ধ নেই বাস।

বললে রাখাল, অবাক হয়ে, 'কৈ মা !......বটে তো !'

......'গন্ধ কি হল !'

মা এগিয়ে থতমত। রাখাল, অবশ চোখ, কপালে ওঠা ভুরু।

'যাক্ !' শেষে বিলের জলে মালা ভাসিয়ে এসে, রাখাল মোছে চোখ মুখ।

গোহালের দোর খুলে দেয়।

একরত্তি গামছাটুকু। তাতেই মাথায় পাগ বেঁধে, বগলে বাঁশী, গাইয়ের সা'র সাথে রাখাল চলে মাঠের পথে।

চার

নীলা কপিলা, ধবলী তিন গাই। আগে নীলা, ধবলী মাঝে, পিছে কপিলা। দু'গাইয়ের বাছুর তিলকী আর কাজলী। কপিলা চলে একা।

মাঠের ঘাসের মাথা তোলে, রাখালের বাঁশীর স্থর কাঁপে, গাইয়েরা চলে এক পা, আর পা, এক পা ও পা।

পথের দু'ধারে যার ঘরে যত আছে শিশু মাণিক মণি, আর মাটিতে মাটিতে বনে যত গাছে কীট-পতঙ্গ পিঁপড়ে, সবার জন্মে কপিলার দুধের বাঁটে ঝরণা নামে ; দুধের চারটি ধারে পথ ভেজে, দুধ বরণ মাটি হাসে ......রোদে ধব্-ধব্, ছায়ায় চল্-মল্।

তিলকী ধুলো উড়োয়, চলে মার সাথে, কাজলীর খুর মাটিতে কাটে দাগ, মার সাথে যায়, আর কপিলা চলে হাঁসের পায়ে—চলে কি, চলে না।

'কেন রে ?'

বাঁশীর সুর ভেঙে, কাছে এসে এগিয়ে রাখাল দেখে, পথের মাটিতে দুধের ধার লাল—যেন সিঁদুর-গোলা পোঁচ্। কাঁপা বুকে রাখাল উবু হয়ে দেখে, কপিলার বাঁটে কিসের চিরুণ দাঁতের দাগ।

'—রক্ত।'

বাঁশী গুটিয়ে রাখাল দাঁড়াল। কোন্ না-জানি নাগে কপিলার বাঁট কেটেছে, দুধের ধারা শুষে নিচ্ছে।

গামছার সরু পাগ রাখাল ফেললে খুলে। ছিঁড়ে, বিলের জলে ভিজিয়ে, কপিলার বাঁট বেঁধে দিলে। তারপর, আবার বাঁশী মুখে তুলে, দিলে সুর।

পাঁচ

আর রাখাল, মাঠে গেল না। মা বৌয়েরা ফিরতি সুরের চাপল বাঁশী আবার শুনল বিলের পাড়ে। রোদের পহর আধখানা করে রেখে গাইয়ের সা'র ফিরল। ফিরে এসে, রাখাল, কাদা ধুলো পায়ে, আগুনে বেঁধে গাছের ছায়ে, গাই বাছুরকে খোলা বিচালী দিলে।

দিয়ে, না গেলে ঘরে গোহালে, না ডাকল মাকে, না গায়ে তেলের ছোঁয়াচটুকু, না কলার পাত্ কাটল না চান্, শুনলে—পাতার আড়ালে ঘুঘু ডাকছে, কাক শালিক জটলা করছে, চিল ফিঙে হাওয়া কাটছে, মাকে বললে—

'মা! আমি আসচি।'

ছয়

দু'সারে বর্শা, শূল, ঢাল, খড়গ ঝগ্-ঝগ্ করছে। নড়ে না চুল-টুকু। রাজা, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র রাজসভাতে অবাক হয়ে আছেন। হাতে খোলা তরোয়াল, আর-হাতে তেউনপরা রাখালকে ধরে কোটাল আছে দাঁড়িয়ে, রক্ত-ফাটা চোখ। রণ-সিপাইরা ঘিরে

আছে—এতটুকু এক রাখাল, সেই কিনা তিন দেউড়ীর ছাপ্পান্ন সিপাইকে চড় মেরে, অন্দর ডিঙিয়ে গেল রাণীর মহলে!

রাজা মুকুট খুলে, নামিয়ে রেখে বললেন, 'রাখাল, এক নয় দুই নয়—তুমি তিন তিন দেউড়ী পার হয়ে গিয়েছ, যেই তুমি হও, তোমার মত বীর আর আমার রাজ্যে নেই। কি তোমার চাই, বল?'

হীরে জ্বলজ্বল্ মেঝের উপরে বাঁশীখানি শুইয়ে রেখে, মাথা নুইয়ে বললে রাখাল, 'মহারাজ, পাই অভয় তো বলি।'

'বল, নির্ভয়।'

বললে রাখাল, 'মহারাজ, আপনার কাছে তো চাইনি কিছু আমি, চাই যা, তা রাণীমার কাছে।'

পাত্র-মিত্র যন্ত্রী-মন্ত্রী বললেন, 'তা বেশ, বল আগে কি চাও?'

রাখাল বললে, 'মহারাজ আপনার রাজত্বে বাঁশী আমি বাজাই, সেই বাঁশী আমার থামল।—থামুক। এই নিন্, রইল বাঁশী আপনার। কিন্তু—রাজ্যের কীট-পতঙ্গ, কাঁচা-কচি সব্বার মুখের দুধের সাগর যে শুকিয়ে যায়—রক্ত কেন দুধের বদলে, কপিলার বাঁট কেন কাটে নাগে? পাটরাণী হলেন মা রাণী, আমি তাঁকে এ কথা শুধোব।'

রাজসভা থমকে যায়। পাট সিংহাসন কেঁপে উঠে। পুরী কেঁপে ওঠে। কপিলা গাই, তার বাঁট সাপে কাটে।

সভা, রাজা ভেঙে দিলেন। বাঁশী রাখালের হাতে তুলে দিয়ে রাজা বললেন, 'রাখাল, বাঁশী বুকে তোমার অক্ষয় থাকুক; কোথায় থাক তুমি, চল, কপিলা আমি দেখব।' লোকলস্কর, মন্ত্রী নিয়ে রাজা চললেন রাখালের সাথে।

যন্ত্রী-তন্ত্রী, শাস্ত্রী-সিপাইরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কোটালের রক্ত চোখ শক্ত হয়ে থাকল তার কপালে গিয়ে।

হাতের তরোয়ালখানা তার ঝনাৎ করে পড়ে গেল।

সাত

পান্ত পেতে, মা আছে বসে। ফেরে না রাখাল। মাথার রোদ নামল পাথারে। পথ-পাখালীর চোখ আঁধার।

সাঁজের পিদিম মা, জ্বালল।

না।

রাখাল আসে না।

পেঁচা ডাক থামিয়ে পালায়। শেয়াল ডাকে দূরে। পথের মাটিতে ঝাঁকি লাগে,—কিসের শব্দ?—

চেয়ে মা দেখে, বেটা তার আগে আগে, পিছে দু'সারে মশাল, ঝিক্-ঝিক্ ঝিলিক্-মিলিক্!

—ও কারা?

মা ঠাহর করতে পারে না। পাড়া-পড়শীরা দোর খোলে তো, দুড়দাড়্ খিল আঁটে। 'মা! মা!' বলে রাখাল এসে পা আঙনে দিতেই,—সব দেখেই তো মা, দাঁড়িয়ে পড়ে মূর্ছা যায়।

রাজা আসেন আগে। অভয় দিয়ে আস্তে, রাজা, তারপর গোহালে যান। দেখেন, তিন গাই দু'বাছুর গোহালে!

রাজার চমক লাগে। শঙ্খ চোখ পদ্ম গা, সোনার খুর শিং রূপা, সত্যই তো এক কপিলা!

মাকে বুঝিয়ে এসে রাখাল খুলে দেয় কপিলার বাঁধন। রাজা দেখেন, মাটি ছোঁয় ছোঁয় বাঁট, কপিলার সেই বাঁটের দুধ উবে গেছে—

—রক্ত ঝল্-ঝল্ বাঁট!

চার খুরে কপিলার, মুকুট ছুঁইয়ে মাথায় তুলে, রাজা হুকুম দিলেন, 'কাণাৎ ফেল।'

আট

খবর গেল। থানায় থানায় রাজকটক, পহর রাত না যেতে 'হাঁঃ হাঁঃ' শব্দে জোর কটক জমল এসে।

মাঠ জুড়ে কাণাৎ পড়ে।

মশাল আর মশাল, পাহারা বসে গোহালে। মশার একটি ছানাও বসতে পায় না কপিলার গায়ে।

সূঁচ ফোটা আঁধার কাঁপে। রাখাল জাগে মশালের সাথে।

দুপুর রাত কেটে, নিশুতি পড়ল। পড়তেই, হীল্ হীল্ হীল্ ক'রে সোনালী ডোরা এক কী যে সাপ, দেখতে না দেখতে ঝলকে সব পাহারা এড়িয়ে গিয়ে হিস্ হিস্ শব্দে গোহালে পশে' কপিলার চার পা জড়িয়ে ছাঁদন দিয়ে···দুধ খায়!

যত পাহারার গা কাঁটা দিয়ে উঠল, এলোমেলো মশাল সা'র ঝাঁটা হেন হটল, রাখালের দু' চোখ ভাঁটা ঘুরল, শাস্ত্রীসিপাই লোকলস্কর সারা কটক জমা হল; কিন্তু কে ছোঁবে এ সাপ?

টাঙ্গী লাঠি, শূল, তরোয়াল নীচুমুখ হয়ে রইল। রাজার হাতে মণিমুখ খড়গ ঝুলে পড়ল, কপিলার চার পা জড়িয়ে নিয়ে দুধ খায় সাপ, কি ক'রে মারবেন?

হাতের অস্ত্র হাতে, সিপাই-ই কি, রাজাই কি দাঁড়িয়ে। আর, ছিল যারা সাপুড়ে, চুল খাড়া তাদের, তন্ত্র মন্ত্র পড়বে কি, দুধ খায় সাপ আর পলকে পলকে বাড়ছে। দণ্ড না যেতে সাপের গা গোহালে ধরে না, আগুনে ধরে না, লেজ গিয়ে ঠেক্‌ল রাজার কাণাতের কোণে!

দু'দিক থেকে তীর আসছে, তরোয়াল হানছে, লাঠি কুড়ুল শূল বল্লম যত অস্ত্র পড়ছে, ঠিকরে যায় সব! পিছলে যায় সাপের গায়ের হিমে!

সবাই হাঁপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মশালচীরা মশাল চেপে ধরল। না কিছু না ফোস্কাটুকুও। সাপ, শুধু দিলে আসল ভেঙ্গে একটুকু মোড়ামোড়ি।

কপিলার দুধ ফুরিয়ে যখন বাঁটে ঝরলে রক্ত, সাপ তখন বাঁট ছেড়ে দিয়ে জিভ্ বাড়িয়ে, যে পড়ল সামনে তাকেই জিভে টেনে পুরে, লোকলস্কর সৈন্য সিপাই—রাজকটক টপ্ টপ্ গিলে গিলে চলল!

মুকুট এঁটে, সামনে উঁচনো খড়গ রাজা দাঁড়াতেই হেঁকে, শেষ সিপাই ফেলে লক্‌লক্‌লিক করে রাজাকে জিভে তুলে নিশুতির আঁধার শিউরিয়ে সাপ মাঠ জাঙ্গাল বিল সায়র পেরিয়ে, নদীর জল চিরে ভেসে চলল মণি মাথায়, যেন কোন্ সোনার চৌদ্দ ডিঙা…কালবৈশাখীর ঝড়ো পালে ছুটেছে—সোঁ! সোঁ! সোঁ!

দোর দ্বার জোরে ভেজানো, ঘরের বাতি ঘরে নেবানো—পাড়া-পড়শী গাঁয়ের জন কাঁপে থর, থর, থর—কে জানে আর রাখালের মা জীয়ন্ত আছে কি নেই?

আঁধার ফাটিয়ে কোথায় যে সে সাপের শিস্ গর্জে—যেন উথাল সমুদ্দুরের ডাক!

নয়

খবর রাজপুরীতে। যেতে আর না যেতে রাজ্যের চারিদিকে হাহাকার! রাজা নেই, রাজার রাজ্যে হল অরাজক। রাণী যে সায়র জলে ডুব দিলেন, উঠলেন না আর। প্রজাজন আপন বুকে শূল গেঁথে, রাজার শোকে দলে দলে মরল। পাত্র-মিত্র সায়-সামন্ত সাধ-সরিক কেটে, মণি-ভাণ্ডার লুটে, কোটাল হল রাজা।

তন্ত্রী-যন্ত্রী নিয়ে লোহার মুকুট মাথায় কোটাল রাজত্ব করে।

রাজত্ব না রাজত্ব, ঘাট নেই হাট নেই, পথ চলবার বাট নেই, খাঁড়া-তরোয়ালের সবুর সয় না, কোটালের রাজ্‌গি, জনমনুষ্যের মাথা হাতে কাটে।

রাজ্যে খা খা।

না ক্ষেতে ধান, না পাখির গান, রাত না পোহাতে শকুনী-গৃধিনী উড়ে।

ধুলোয় অন্ধকার।

কেবল, রাজার যে একা রাজকন্যা, ধবল পাহাড়ে তাঁর পুরী—রাজকন্যা ব্রত করেন, নিয়ম করেন, রাজ রাজ্যের খবর যায় না তাঁর

কাছে।

ধবল পাহাড়ের নীচে ধবল সমুদ্দুর। ধবল সমুদ্দুরে রাজকন্যার শ্বেতপঙ্খী ভাসে, ভোর উষায় রাজকন্যা শ্বেতকমল তোলেন আর শ্বেতপাথরের মন্দিরের জোড় শঙ্খ বাজে।

রাণী নেই, রাজা নেই, রাজকন্যার কাছে কে দেয় খোঁজ, রাজ্য আছে, না আছে?

ভোর পাহাড় রাঙিয়ে সূর্য দেয় উঁকি, শ্বেতপঙ্খীর শাদা পালে পড়ে সেই রঙের ছায়া, পাগল হাওয়ায় পাল ফুলিয়ে শ্বেতপঙ্খী ফিরে পদ্মের বন দিয়ে।

যখন বাতাস থাকে ঝির ঝির তার কত আগেই রাজকন্যার ফুল তোলা হয়ে যায়।

চার পাড়ের কত দেশের রাজপুত্রেরা শ্বেত হাতীতে চড়ে আসেন সেই ঘাটে নাইতে; নেয়ে, আস্তে মন্দিরে প্রণাম করে, মন্দিরের ঘণ্টায় সুর দিয়ে যান।

কোনদিন কেউ রাজকন্যার পায়ের জলের দাগ দেখতে পান, কিন্তু রাজকন্যাকে কেউ দেখতে পান না।

রাজপুত্রদের সোনার শিঙার সুর সমুদ্দুরের উপর দিয়ে ভেসে যায়।

দশ

সেই সুর ধরে ধরে এক রাক্ষসী নীল তার গা, শাদা তার চোক, পা তার কটাসে, ধবল সমুদ্দুরে ঘুরে বেড়ায়, কাকে পাব কাকে খাব। ঝাকড়া চুলে, আগুনের না'য়ে রাতরাক্ষসী সারা সমুদ্দুর থৈ থৈ করে।

পায় না জনমানুষ। লাল লক্ লক্ জিভ বের করে খোঁজে রাজকন্যার পায়ের দাগ, তা রাজকন্যার পায়ে তো ধূলো নেই, পায়ের জলের দাগ, রোদ পড়তেই শ্বেত পাথরে শুকিয়ে যায়; রাতে কোথায় পাবে? ছুতো পায় না রাক্ষসী কি করেই খায় যে রাজকন্যাকে।

ধোঁয়ার বৈঠায় আগুনের না' বায়, সমুদ্দুর চষে বেড়ায় আর হাঙর তিমি গিলে খায়।

ভোরের আগে, শ্বেতপক্ষীতে নিশান না উড়তেই, আপন না' ডুবিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায় ধবল সমুদ্দুরের জলে।

নয় তো, পড়ে যদি রাজকন্যার চোখে, চাই কি, ফুল হয়ে যদি যায় ফুটে।

ওমা !! রাক্ষসী কি তা কখনো পারে ? না পড়তেই ভোর পাখীর ডাক, দাঁত করে কড়মড়, গা করে গস্‌গস্ ধোঁয়া এলিয়ে আগুনের না' নিয়ে ভু-উ-স্ করে ডুবে যায়।

কোথায় গিয়ে সে আবার উঠবে, কেউ তা জানে না !

রাখাল ?

কপিলার পিছনে ছিল দুধের বাটের পাহারা। ভোরে, যখন চমক ভাঙল, উঠে দাঁড়াল রাখাল।

গিয়ে দেখে, মার নেই চেতন। মেঝেয় গড়ানো বালিশ, আস্তে মা'র শিয়রে এনে দেয়। জলের হাত দিয়ে, বাতাস দিয়ে মুখে চোখে দোরখোলা রোদে বসে।

তার পর এসে গরুবাছুর বের করে, গোহাল মুক্ত করে।

পাড়া-পড়শীরা জাগল। মা জাগল দুপুর গড়ালে।

নাওয়া কি, খাওয়া কি আর, দিন যায় রাতও যায়।

কোনো সাড়া নেই

পরদিন নিজে খেয়ে, মাকে খাইয়ে, বাঁশী হাতে বাঁশবনের ছায়ায় বসল !

বাজায় না।

ক'দিন গেল। দিন যেতে, একদিন মাকে বলে, 'মা, আসি তো একটু।'

বুকে টেনে নিয়ে মা বলে, 'সোনা !! কোথায় যাবি মানিক !'

রাখাল বললে, 'ডর নেই মা, এখনি আসব।'

দূর পড়শীরা শোনে, বিলের সে-পাড়ে রাখালের বাঁশী বাজে, বাজতে বাজতে থামে। এ গাঁ থেকে সে গাঁ, সে গাঁ থেকে আর গাঁয়ে, রাখাল পথ চলতে, আটক। পথ ঘাট কি আর আছে? কোটালের সিপাই জন বন ঘুচিয়ে জল, জল বুজিয়ে মাঠ করেছে, রাজপুরীতে যাওয়ার পথ নেই।

কোন্ দিকে ডান, কোন্ দিকে বাঁ, কেউ বলে না কোটালরাজার ডরে।

গালে বাঁশী ঠেকিয়ে, রাখাল চেয়ে থাকে। তার পর কাজল নদীর পাড় ধরে চলে, যেদিকে উজান।

কাজল নদীর বাঁকে বাঁকে বাঁশীর সুর থামে।

এগারো

এক সে চিল। উড়ছে। গাছ আছে পাতা নেই। উড়তে উড়তে হায়রান হয়ে, কি করবে, বসল এক বটগাছের শুকনো ডালে।

সেই গাছের নীচে, বাঁশী বুকে রাখাল ঘুমোয়।

কত দেশ, কত বন, পাহাড় পর্বত ছাড়িয়ে এল যে রাখাল, কাজল নদীর উজান ধরে, তবু রাজপুরী তো মেলে না!

সেদিন গেল যে পথে, পারে হল ভুল!

রাখাল যায়, নদীর বাঁকে বাঁকে দাঁড়ায়, দেখে চেয়ে, অচিন ন-চিন এ কোন্ দেশ, গাছে নেই পাতার পোম্, মাঠে নেই ঘাসের ছোপ, না চরে গাই, না সরে নৌকো, জন মনিষ্যি কেউ কালা, কেউ বোবা, কেউ খোঁড়া, কেউ কানা। রাখাল শুধোয় তো শোনে না, শোনে তো বলে না, বলে তো চলে না, আর চলে তো দেখে না চক্ষে।

রাখাল সুধোলে বলে,

'কার খাই, কার লাগি,
কার ঘরে নিশি জাগি,
কি জানি
কে রাজা, কে রাণী?'

রাখাল ভাবে, রাজা নেই, বুঝি রাণীও নেই। রাজার যে রাজকন্যা, রাজকন্যাও কি নেই? কোন্ দেশে যে সে রাজকন্যা, কি জানে রাখাল? রাখাল শুক্‌নো বটের তলে বাঁশী নামায়।

ভাবতে ভাবতে রাখাল, মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

চিলের ডাকে রাখাল জেগে দেখে, রোদ পড়ে আসে। রাখাল উঠে বসে।

চিল উড়ে যায়।

কোথায় যাবে রাখাল? যে পথে যায় চিল. চোখ মুছে বাঁশী তুলে নিয়ে চলে সেই পথে।

বারো

যায়।

রাত ঘনিয়ে আসে। থম্ থম্ করে চারদিক। কোথায় যে চিল, কোথায় যে কি, এক তেপান্তর। রাত যায়, দিন যায়।

রাখাল বাঁশী তুলে নেয় মুখে। বাঁশী বাজায় চলে; বাঁশী বাজায়, তেপান্তর পার হয়ে যায়।

পার হয় গহন বন। গহন বনে বাঘ ভালুক। বাঁশী বাজায় রাখাল। যায়। লতায় পাতায় পথ নেই! তবু যায়। অফুর বাঁশী বাজায়। আবার যায়। আবার রাত ঘনিয়ে আসে, তবু চলে রাখাল, বাঁশী বাজায়।

মাস, দিন, বছর চলে রাখাল দেখে, সেই কাজল জল নদী। ধবল হয়ে, ঝর্ণা ধারায় ঝরছে নদী, ঝির্ ঝির্ ঝির্ গহন বন দিয়ে, সরু থেকে সুতো সরু!

সাত দিন সাত রাত ধরে চলে চলে, পাহাড়।

জ্যোছ্না!!

জ্যোছ্নায় আর জ্যোছ্নায় আর পাহাড়ে ময়! আর থৈ থৈ থৈ জল!

জ্যোছ্নায় পাহাড় হেসে উঠে, জলের ঢেউ নেচে উঠে, ঝিরি ঝিরি

ঝর্ণা ঝিক্‌মিকিয়ে খেলা করে।

ভুলে, রাখাল, দাঁড়িয়ে রইল। থাকে। তারপর এক পাথরে বসে, বুক ভরে দেয় বাঁশীতে সুর।

তেরো

নাঃ। নীল রাক্ষসী লাল হয়, লাল রাক্ষসী কালো হয়, তবু আর পারে না!

ধোঁয়ার বৈঠা আগুনের না' নিবু-নিবু, রাক্ষসী না পারে টানতে, না পারে কাঁদতে!

কিসের সুর!

এমন সুর তো রাক্ষসী আর শোনে নি! দেখে, উদল গা, উদল মাথা এক ক্ষুদে মানুষ, ফটিক জ্যোছ্‌না নাচিয়ে দিয়ে বাঁশী বাজায়। কাজল ঝর্ণার জল ধবল হয়ে ঝরছে যেখানে, ধবল পাহাড়ে ঝর্‌ ঝরো ঝর, সেইখানে বসে বাজায় বাঁশী, দুধের বরণ জলে পা ডুবিয়ে, ধবল পাহাড় হাসিয়ে আর সমুদ্দুর ধাঁধিয়ে দিয়ে!

রাক্ষসীর গা মুড়ে আসে, রাগে উঠে ফুলে জিভের লাল টস্‌টস্‌ করে, গড়ায়, হাতে বৈঠা তার ধুঁইয়ে যায়, উল্টো জিভে ঠোঁট চেটে কথা দাঁতে কেটে কেটে রাক্ষসী বলে…

'তুই কেরে?'

ক্ষুদে মানুষ কি জানে না শোনে? বাঁশী বাজায়!

চুলে হাওয়া জড়িয়ে, দাঁতে জিভ ছড়িয়ে রাক্ষসী আবার বলে—

'কে রে তুই?'—

শোনে না কিচ্ছু ক্ষুদে মানুষ। বাঁশী বাজে। জ্যোছ্‌না উছলে সমুদ্দুর উথলে ঝর্ণা ঝলকে শ্বেতপাহাড়ে মধু মেখে, বাঁশী বাজে। চুল উড়িয়ে করাতে, দাঁত নিয়ে রাক্ষসী গর্জে আসে—'কে তুই?—দাঁড়া—'

সমুদ্দুরের জলে ডাক উঠে, শব্দে বাঁশী ছেড়ে, ফিরেই দেখে মানুষ—জল তোলপাড় করে পাহাড় ভেঙ্গে আসে—সাপ! বাঁশী বাজতে

বাজতে ভোর হয়ে গেছে, রাজকন্যার ফুলতোলা ভুল হয়ে গেছে, গেছে শ্বেতপক্ষীতে দাঁড়িয়ে রাজকন্যা, দেখতেই চেয়ে, সোনালী ডোরায় ডোরায় সাপ লাখো কমল হয়ে ফুটে রইল পাহাড় তলে ধবল সমুদ্দুরের দুধজলে।

সহস্রদল কমলের মত রাজকন্যা, বললেন—

'কে তুমি?'

'আমি রাখাল।'

বাঁশী ছুঁয়ে আস্তে, শ্বেত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রইল রাখাল

রাজকন্যা বললেন, 'রাখাল তুমি?'

'বাঁশী···

···আবার বাজাবে?'

রাখাল আসে।

সমুদ্দুর শিউরে উঠে, পাহাড় শিউরে থাকে শ্বেতপক্ষীর গলুইয়ে বসে বাঁশী বাজায় রাখাল।

চৌদ্দ

ধবল পাহাড়ের মন্দিরে, গন্ধে দিক ছায়।

অচিন্ ফুলের মালা!

মন্দিরে ঘণ্টা বাজে।

রাখাল বলে, 'রাজকন্যা, এ ফুলের মালা পেলাম আমি, কাজল নদীর জলে।'

রাজকন্যা বলেন, 'এই ফুল তো জগতে নেই, মন্দিরে আসে, সোনালী হয়। তোমার আমার দেশে আমার বাবার রাজ্যে এই কাজল জল নদী, বছরের একদিন এই মালা আমি তারি জলে দি, সেই মালা, রাখাল তুমি পেলে।'

ডাগর চোখে রাখাল বলে,

'কেন গন্ধ উবে যায়, রাজকন্যা?'

'নিঃশ্বাসে .'

'কিসের ?'

'নয় তো কোটালের, নয় তো সাপের।'

'গন্ধ উবে, দুধ শুকায়, রাজ্য উজাড় যায় ?'

মুক্তাজলের নহর গলে ; দু' চোখ ফুলের মালায় রেখে, রাজকন্যা বলেন—

'সব যায়।'

ঝর ঝর চোখ রাখাল, আপন বাঁশী কুড়িয়ে নেয়, 'রাজকন্যা, যে রাজকন্যা, আগে না জানি! মাপ চাই, রাজকন্যার রাজ্য জন কেন রাজকন্যা, ছারখার যায় ?'

শুনে রাজকন্যার চোখের জল ফুলের মালায় শ্বেতচন্দন হয়ে ঝর্‌তে থাকে। বাঁশী হাতে রাখাল, কাজল ঝর্ণার কিনারে গিয়ে বসে। বাঁশীতে সুর দেয়।

পনেরো

যত দেশের রাজপুত্র সমুদ্দুর নাইতে এসে সারাদিন সেই সুর শোনেন।

শোনেন, ব্রতপাট নিয়ে রাজকন্যা আপন রাজ্যে যাবেন।

শোনেন, দোল চৌদোলে যাবেন না, জন জৌলুষ নেবেন না, রাজকন্যা পায়ে হেঁটে যাবেন।

শোনেন, ঢাক নকড়া বাজাবে না, খাঁড়া তরোয়াল সাজবে না, শুধু মন্দিরে বাজবে শাঁখ আর পথে বাজবে বাঁশী।

শুনে রাজপুত্রেরা পথের দু' ধারে সার দিলেন। না হাতী সাথে, না ছত্রমুকুট মাথে, কাঁকন কুণ্ডল খুলে, হাতে বনফুলের মালা, রাজপুত্রেরা চোখে পলক ধরেন।

মন্দিরে শাঁখ বাজে, পাহাড় সমুদ্দুর সুরে ভাসে, রাজকন্যার পা পাথর ছেড়ে এসে, পড়ে মাটিতে।

বেজে উঠে রাখালের বাঁশী।

পথে পথে গাছের ফুলে, রাজপুত্রদের হাতের ফুলে, পাখির মুখের ঘাসের ফুলে, হাওয়ার ওড়া বনের ফুলে রাজকন্যার হাঁটন পথ ছেয়ে যায়।

আপনি খোলে পথ, আপনি জাগে ঘাট—বসত, বন, মালঞ্চ, নগর, মাঠ।

আর, লোকজনের কলরব!

আলোর সোনায় মাটি হাসে, কন্যা আসেন; বাতাস ছেয়ে যায় রাখালের মোহন বাঁশীতে আর ঢেউয়ে নেচে কাজল জল নদীর তর্‌তর্‌ তর্‌তর্‌ কালো কাজল জল, খেয়ে চলে উধাও ছুটে—রোদ পহরের ঝলক লুটে—যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে নীলা কপিলা ধবলী গাই, কখন রাখালেব বাঁশী শুন্‌ বলে।

আলোর শিখা

সুনির্মল বসু

সেই ছোট্ট মেয়ে ঝুমঝুমি। যাকে দুটো খাওয়াবার জন্য বাড়ীর আটটা প্রাণী হিম্‌সিম্ খেয়ে যেত! সারাদিন খই ফুটত যার মুখে! যার হাসি ম্লান করে দিত সূর্যের তেজ বা চাঁদের স্নিগ্ধতাকে! ওর কচি মুখের ছোট ছোট ছড়া বা 'টা—টা' শোনার জন্য ভিড় করত প্রতিবেশীরা!

সেই ঝুমঝুমি আজ আট বছর পূর্ণ হল। অর্থাৎ আজ তার জন্মদিন।

এই কয়েক ঘণ্টা আগে সে যা দেখালো তা বাস্তবে সম্ভব নয়। গল্প, উপন্যাস বা সিনেমার পর্দায় দেখা যায় ঐ দৃশ্য।

বিপ্লবী নীহার মুখার্জীর একমাত্র নাতনী।

নীহারবাবু তার স্ত্রী, দুই পুত্র, অনিল ও মাধব। বড় ছেলে অনিল বিবাহ করেন নি। ছোট ছেলেও প্রথমে আপত্তি করেছিল পরে রাজি হয় সকলের চাপে পড়ে।

প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীতে লোক মাত্র আটজন। নীহারবাবু, তার স্ত্রী, দুই ছেলে, এক বোন ও তিনজন ঝি-চাকর। সুতরাং বাড়ীর একমাত্র বৌ হিসাবে বিশাখা খাতির যত্ন একটু বেশীই পেত। তারপর এল একটি ছোট্ট ফুল। ওকে কে কি রকম ভাবে বেশী ভালোবাসবে,

বেশী আদর করবে, এই নিয়ে সারা দিন-রাত প্রতিযোগিতায় মেতে থাকত মুখার্জী বাড়ীর সকলে।

সেই আজ যা দেখালো, যা শেখালো তা চিরদিন অমর হয়ে থাকবে এই বাড়ীর প্রতিটি মানুষের মধ্যে, এই পাড়ার প্রতিটি মানুষের মধ্যে, এই দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে।

এই মাত্র প্রায় শ' তুয়েক লোক মুখে ম্লান হাসি নিয়ে হস্‌পিটাল থেকে বাড়ী ফিরছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন সব ঠিক আছে ভয়ের কোন কারণ নেই। কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে। ঈশ্বরের কৃপায় কোন ক্ষতি হয় নি তার।

আজ সকাল থেকেই সারা বাড়ী গম্‌গম্‌ করছে লোকজনের কোলাহলে। সকলেই ব্যস্ত।

কিন্তু যার জন্য এত ব্যস্ততা সে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। সে কেবল একটা কথাই জানে যে আজ তার জন্মদিন। আজ রাতে বাড়ীতে নাকি খুব মজা হবে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে গেয়ে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে বুলি। যার কাছেই যাচ্ছে সেই একবার গাল টিপে তাকে আদর করে দিচ্ছে।

নাতনীর জন্মদিন উপলক্ষে প্রচুর বাজী পোড়াবার ব্যবস্থা করেছেন নীহারবাবু।

সন্ধ্যে হতেই দলে দলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসতে থাকে নানান উপহার সঙ্গে নিয়ে। বুলির সমবয়েসীরা সকাল থেকেই এসে গেছে। একটা বড় ঘরে সকলে মিলে খেলা করছে বুলির সঙ্গে। বাচ্চাদের চেঁচামেচি একটা স্বর্গীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে সারা বাড়ীতে। বেলুন, ফুল আর টুনিলাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা বাড়ী।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এবার বাজী পুড়তে আরম্ভ করল উঠোনের মাঝখানে।

কোনটা রকেটের মত আকাশে উড়ে গিয়ে ফেটে যায়, কোনটা

রং-বেরংয়ের ফোয়ারা ছুটিয়ে ঘুরতে থাকে উঠোনের মাঝখানে। বাচ্চাদের হাসির কলকলানিতে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ।

এক কোণে দাঁড়িয়ে এই আনন্দমুখর দৃশ্য দেখতে থাকেন নীহারবাবু। আনন্দে ভরে ওঠে তার বুক। ঠিক যেমনটি হয়েছিল যেদিন তিনি যোগ দিয়েছিলেন আজাদহিন্দ্ ফৌজে।

হঠাৎ একটা হাওয়াই বাজী গোঁ করে নীহারবাবুর কানের পাশ দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। ঠিক সেই সময় বামুনঠাকুর কেরোসিন তেল নিয়ে কি করতে যাচ্ছিল দম্ করে হাতের ড্রামটা উল্টে পড়ে যায় মেঝেতে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। কেউ কিছু বোঝার আগেই সারা বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের শিখা।

যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। সকলে নিরাপদ দূরত্বে যেতে চায়।

নীহারবাবুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে যুদ্ধের বিভীষিকা। তিনি এক দৌড়ে বুলিকে ধরে রাস্তায় বেরিয়ে যান।

কেউ দলবল ডাকতে ছোটে, কেউ জলের জন্য চেঁচাতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে শ'য়ে শ'য়ে মানুষের ভিড় হয়ে যায় জ্বলন্ত বাড়ীর সামনে।

বুলির হাত ধরে একভাবে দাঁড়িয়ে নীহারবাবু তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন ঐ দৃশ্য। বাড়ীর আর সকলে আগুন, নেভাবার জন্য ছুটোছুটি করতে থাকে।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে বুলি 'দাদু মানদা মাসীর ছেলেটা আছে নীচের ঘরে' বলে এক ঝট্‌কা দিয়ে নীহারবাবুর হাত ছাড়িয়ে কেউ কিছু বোঝার আগেই এক ছুট্ দিয়ে জ্বলন্ত বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে।

প্রচণ্ড চিৎকার করে সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েন নীহারবাবু।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বুলি একটা বছর খানেকের বাচ্চা বুকে জড়িয়ে জ্বলন্ত জামায় উঠানের মধ্যে ধপাস্ করে আছড়ে পড়ে।

তিনজনকেই এক সঙ্গে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সব শেষে জ্ঞান ফেরে নীহারবাবুর। ধড়মড় করে তিনি উঠতে যান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন বিছানায়।

শিশুটার বিশেষ কিছুই হয় নি। সামান্য ওষুধ দিয়ে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়।

বুলি যে ভালো আছে সে খবর প্রতিবেশীরা সকলেই জানে। আগামীকাল বিশ্বের সকল মানুষ জানবে। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নীহার মুখার্জীর নাতনী বুলির অগ্নিজয়ের অমর কীর্তি। তার আলোর শিখা ছড়িয়ে যায় দিকদিগন্তে।

ফার্স্ট-ক্লাস ভূত

প্রমথ চৌধুরী

আমরা তখন সবে কলকাতায় এসেছি ইস্কুলে পড়তে। কলকাতার ইস্কুল যে মফঃস্বলের চাইতে ভাল, সে বিশ্বাসে নয়। কারণ ইস্কুল সব জায়গাতেই সমান। আমরা এসেছিলাম ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে।

আমরা আসার মাস তিনেক পরে হঠাৎ সারদা-দাদা এসে আমাদের অতিথি হলেন। সারদা-দাদা কি হিসেবে আমার দাদা হতেন, তা আমি জানিনে। তার বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়। দেশ তাঁর যেখানেই হোক, সেখানে তাঁর বাড়ি ছিল না। তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মত দেদার জমিদারবাবুর ছিলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা না একটা সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক যে কি তাও কেউ জানত না; কিন্তু এর-ওর বাড়িতে অতিথি হয়েই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। আর সব জায়গাতেই তিনি আদর-যত্ন পেতেন। তিনি একে ব্রাহ্মণ, তাঁর উপর কথায়-বার্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। তাই তিনি দাদা হোন, মামা হোন, দূর সম্পর্কে শালা হোন, ভগ্নীপতি হোন—সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারও কাছে চাইতেন না। তাঁর নাকি কাশীতে একটি বিধবা আত্মীয়া ছিলেন, আবশ্যক হলে তাঁর কাছ থেকেই টাকা পেতেন। সে মহিলাটির নাম সুখদা, সুখদার নাকি ঢের টাকা ছিল, আর সন্তানাদি কিছু ছিল না। তাই সুখদার আপনার লোক বলে তাঁর মানও ছিল।

সারদা-দাদার আগমনে আমরা ছেলেরা খুব খুশি হলুম, যদিও

ইতিপূর্বে তাঁকে কখন দেখি নি, তাঁর নামও শুনি নি। আমাদের মনে হল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাঁচব। কলকাতায় আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না, কোন বন্ধু-বান্ধবও ছিল না, যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে সময় কাটানো যায়। আর ইস্কুল সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প করেও চমৎকৃত হতুম না, কারণ সেকালে কলকাত্তাই ছেলেদের কথাবার্তার রস কলকাতার দুধের মতই ছিল নেহাৎ জলো।

সারদা-দাদা রোজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের দেদার গল্প বলতেন; জীবনে তিনি যা দেখেছেন, তারই গল্প। মা অবশ্য আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সারদা যা বলে তার ষোলো আনাই মিথ্যে। কিন্তু তাতে আমরা ভড়কাই নি। কেননা মিথ্যা কথা আদালতে চলে না, কিন্তু গল্পে দিবারাত্র চলে। সে যাই হোক, সারদা-দাদা বেশীর ভাগ ভূতের গল্প বলতেন। তবে সে কথা আমরা মা'র কাছে ফাঁস করি নি। শুনেছি বাবার একজন প্রিয় তামাকওয়ালা দাদার কাছে নিত্য ভূতের গল্প বলত, ফলে দাদা নাকি রাত্তিরে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয় পেতেন। তারপর বাবা তাঁর প্রিয় তামাকওয়ালার আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। পাছে মা সারদা-দাদাকে বিদায় করে দেন, এই ভয়ে মা'র কাছে এ গল্প-সাহিত্যের আর পুনরাবৃত্তি করতুম না। তা ছাড়া কলকাতা সহরে ত ভূতের ভয় নেই। রাস্তায় আলো, পথের ধারে শুধু বাড়ি, জঙ্গল নেই। ভূতেরা আলোকে ভয় করে, ও মানুষের চেঁচামেচিকে। কলকাতায় আলো যতটা না থাকে, হল্লা দেদার আছে। অত হট্টগোলের মধ্যে ভূত আসে না। সারদা-দাদা শুধু সেই সব ভূতের গল্প বলতেন, যাদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—আপনি ত' শুধু পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্প করেন, আপনি কি কখনও সাহেব ভূত দেখেন নি?

সারদা-দা উত্তর করলেন—দেখব কোত্থেকে? সায়েবরা ত এদেশে আর মরে না। না মরলে তারা ভূত হবে কি করে? দেখো ট্রেনে এত বড় বড় কলিসান হয়, যাতে হাজার হাজার দেশী লোক মরে; কিন্তু তাতে

কোন সায়েব মরেছে, এমন কথা কি কখনো শুনেছ ?

—তবে এত গোরস্থানে কারা পোঁতা আছে ?

—সব ফিরিঙ্গি। তবে দু'চারজন সায়েব যে মরে না, এমন কথা বলছিনে। কিন্তু যারা মরে ভূত হয়, তাদের আমরা দেখা পাইনে।

—কেন ?

—এদেশে তারা গাছেও থাকে না, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে চড়ে বেড়ায় আর ফিরিঙ্গি ভূতেরা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়িতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম। আর তার হাতে যে সাজা-শাস্তি পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়। আজও মনে হলে কান্না পায়।

—আমরা সেই সায়েব ভূতের কথা শুনতে চাই।

সারদা-দা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—

—আচ্ছা বলছি শোনো। কিন্তু এ গল্প যেন আর কাউকে বলো না।

—কেন ?

—কী জানি, আবার যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই, মরা লোকেরও মানহানি করলে জরিমানা হয়, জেলও হয়। আবার জেল খাটতে আমার ইচ্ছে নেই। এর পর সারদা-দাদা বললেন—

আমি একবার কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছিলুম। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলুম, তখন গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে। তাই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে উঠে পড়লুম এই মনে করে যে পরের স্টেশনে নেমে থার্ড ক্লাশে ঢুকব। গাড়ি ত ছাড়ল, অমনি বাথরুম থেকে একটি সায়েব বেরিয়ে এল। ঝাড়া সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, মুখ রক্তবর্ণ, চোখ গুগলির মত। আর তার সর্বাঙ্গে বেজায় মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, আর সে বিলেতী মদের। সে ঘরে ঢুকেই বললে, 'কালা আদমী, নীচু যাও।' আমার তখন ভয়ে নাড়ি ছেড়ে গিয়েছে, আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'হুজুর আভি কিস্তরে নিচু যায়েগা ? দুসরা স্টেশনমে উতার যায়েঙ্গে।'

তিনি বললেন—'ও নেহি হো সকতা। তোমরা কাপড়া বহুত ময়লা আর তোমরা দেহ্‌মে বহুত বদ্‌ বু। গোসলখানামে যাকে তোমরা কাপড়া উতারকে গোসল করো। আর হুঁই বৈঠ রহো। হাম চলা যানেসে তুম গোসলখানাসে নিকলিয়ো। হাম যো বোল্‌তা আভি করো, জানতা হাম রেলকো বড়া সাহেব হ্যায়?' আমি প্রাণের দায়ে হুজুর যা বললেন তাই করলুম। অর্থাৎ স্নানের ঘরে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে সেই শীতের রাত্তিরে স্নান করলুম। অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে আমার কাপড়-চোপড় উড়িয়ে কোথায় নিয়ে গেল। আমি বিবস্ত্র হয়ে ভিজে গায়ে গোসলখানাতেই বসে রইলুম। আর সায়েব তাঁর কামরায় ছুটোপাটি করতে লাগলেন ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে আমার প্রতি শুয়োর গাধা উল্লুক প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ করতে লাগলেন, আমি নীরবে সব গালিগালাজ হজম করলুম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে কেটে গেল। আমি ভিজে গায়ে হি-হি করে কাঁপছি, সর্বাঙ্গে একটুকরো কাপড় নেই, আর পাশের ঘরে বড় সায়েব মদ খাচ্ছেন ও লাফাচ্ছেন।

মাঝপথে গাড়ি হঠাৎ মিনিটখানেকের জন্য থামল। ক্লিক করে একটা আওয়াজ হল—ছিট্‌কিনি খোলবার আওয়াজ। তারপর গাড়ি ফের চলতে লাগল। পাশের ঘরে টু শব্দ নেই, তাই আমি স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সে ঘরে যাবার চেষ্টা করলুম। ও সর্বনাশ। বড় সায়েব, স্নানের ঘরের দুয়োরে ছিট্‌কিনি টেনে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি সেই অন্ধকূপের ভিতর আটক থাকলুম। আধঘণ্টা পর গাড়ি বর্ধমানে এসে পৌঁছল। আর আমি বাথরুমের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, যা থাকে কপালে ভেবে 'কুলি' 'কুলি' বলে চীৎকার করতে লাগলুম। তারপর একজন কুলি এসে, ছিট্‌কিনি খুলে, আলো জ্বেলে আমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ভূত ভেবে ভয়ে পালিয়ে গেল। শেষটা স্টেশন মাস্টার বাবু এসে—'ভূত নেহি হ্যায়, চোর হ্যায়' বলাতে কুলিরা পাশের ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে মারতে

আধমরা করে প্লাটফর্মের উপর টেনে নিয়ে গেল।

স্টেশন-বাবু বললেন, 'শীগগির ওকে একটা কাপড় পরিয়ে দে।' একজন আমাকে একটি ছেঁড়া কাপড় দিলে, সেই কাপড় পরে আমি স্টেশন-বাবুকে সব কথা বললুম। তিনি বললেন যে রেলের বড়সায়েব এখন সিমলায়; তাছাড়া এ ট্রেনে কোন সাহেব আসেও নি, কোথাও নেমেও যায় নি। এখন বুঝলুম যার হাতে আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি, সে সাহেব নয়—সাহেবের ভূত। তারপর স্টেশন-বাবু আমাকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও প্রথম এক পত্তন মার হল, তারপর দারোগা-বাবুর জেরা। যা ঘটেছিল, সব তাঁকে বললুম। তিনি ভূতের কথায় বিশ্বাস করলেন, কেননা তিনিও একটি পেত্নীর হাতে পড়ে বেজায় নাজেহাল হয়েছিলেন।

তার পরদিনই দারোগাবাবু আমাকে আদালতে হাজির করলেন। আমার অপরাধ নাকি গুরুতর আর অবিলম্বে আমার বিচার হওয়া চাই। হাকিমবাবু ছিলেন অতিশয় ভদ্রলোক, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত, তিনি গাড়িতে ভূতের উপদ্রবের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন। কিন্তু ভগবানের দোহাই ও ভূতের দোহাই ইংরেজের আদালতে চলে না, ভগবান ও ভূত এ দু'য়ের অস্তিত্ব বে-আইনী। অগত্যা তিনি আমাকে এক মাসের মেয়াদে জেল দিলেন। আমার অপরাধ বিনা টিকিটে বিনা বসনে ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে গাঁজা খেয়ে ভ্রমণ। তারপর আমাকে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে—গাঁজা খাও ত খেয়ো। কিন্তু গাঁজায় দম দিয়ে আর কখনো বিনে টিকিটে ট্রেনে চড়ো না, বিশেষতঃ তৈলঙ্গস্বামী সেজে ফার্স্ট ক্লাশে ত নয়ই।

আমি বললুম—'হুজুর গাঁজা আমি খাইনে।' তিনি বললেন, 'গাঁজাখোর বলেই ত তোমাকে লঘুদণ্ড দিলুম, নইলে তোমাকে দায়রা সোপর্দ করতুম।'

এখন তোমরা ফার্স্ট ক্লাশ ভূতের কথা ত শুনলে? এদের তুলনায় পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ঢের বেশী সভ্য।

আমের কুসি

বিভুতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালবেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে। এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল অপু ও অপু—সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্ক মিশ্রিত।

অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কিরে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেল মালা। সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আমকাটা। স্বর নিচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু মাথা নাড়িয়া বলিল—উঁহু।

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস্? আমের কুসি জরাবো…

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে! আমার কাপড় যে বাসি।

তুই যা না শিগ্‌গির করে, আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েছে—শিগ্‌রির যা—তেলটেল যেন মেঝেতে ঢালিস নে—

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা আমগুলি বেশ

করিয়া মাখিল, বলিল—নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলো বুঝি হোল? আচ্ছা নে আর দুখানা—বাঃ দেখতে বেশ হয়েছে রে—একটা লঙ্কা আনতে পারিস্?

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি। মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায় —আমি যে নাগাল পাইনে!

—তবে থাকগে যাক—

খিড়কির দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শোনা গেল—দুগ্‌গা ও দুগ্‌গা—

মায়ের ডাক কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জরানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। ...দুর্গা খালি মালাটা একটান মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল, ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যালো না বাঁদর—নুন লেগে রয়েছে যে! পরে দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা!

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? অতবড় মেয়ে সংসারের কুটো গাছটা ভেঙে দুখানা করা নেই, কেবল পাড়ায় টো-টো করে টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল!

অপু আসিয়া বলিল—মা খিদে পেয়েচে।

—তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিনই ফাইফরমাজ। ও দুগ্‌গা দ্যাখতো বাছুরটা ডাক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শশা

কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত-সুরে বলিল, চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ চিবানো যায় না, আম খেয়ে যা দাঁত টকে—দুর্গার ভ্রূকুটি মিশ্রিত চোখ টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল।

তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি? সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিষণ্নমুখে বলিল—ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি এইতো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—যখন ডাকলে তখন তো—। স্বর্ণ গোহালিনী গাই দুইতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা, ডেকে ডেকে সারা হোল!

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ-দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে! আর কোনদিন আম দেবো—ছাই দেবো!...হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে?...

দুই বন্ধু

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রায় দু'হাজার বছর আগে—

চীনদেশের চু-রাজ্যে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন বড় ধার্মিক ও বিদ্যোৎসাহী। পণ্ডিতদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন, এবং নানাভাবে চেষ্টা করতেন, যাতে পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিরা তাঁর সভায় থাকেন এবং তাঁর রাজ্যে বাস করেন। পণ্ডিতগণও তাঁর গুণ ও গুণগ্রাহিতার কথা শুনে, নানা দেশ থেকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে, দলে দলে গিয়ে তাঁর রাজ্যে বাস করতেন।

এখন, সেই সময় সুদূর উত্তর-পশ্চিমে, পার্বত্য প্রদেশে সো-পো-তাও নামে একজন গুণী ছিলেন। তিনি যখন শিশু, তখন তাঁর পিতামাতা মারা যান। কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেখাপড়ায় আত্ম-নিয়োগ করে তিনি এত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, সকলের পরম সহায় ও সান্ত্বনার স্থল হয়ে ওঠেন।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয় তখন দেখতে পান সর্বত্র ছোট রাজারা নিজেদের মধ্যে সর্বদাই কলহ ও যুদ্ধে মত্ত ; দেশে সহৃদয় লোকের সংখ্যা কত কম এবং যারা অসৎ পথে চলে তাদের সংখ্যা কত বেশি! সেইজন্য তিনি কোন রাজ-সরকারেই চাকরি গ্রহণ করলেন না এবং যখন

শুনলেন চু-রাজ লোকটি সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক তিনি পণ্ডিতদের তাঁর রাজ্যে নিমন্ত্রণ করেছেন, তখন তাঁর গ্রন্থগুলি একটি থলিতে পুরে, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চু-রাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, এবং চলতে চলতে অবশেষে ইয়ঙ প্রদেশে উপস্থিত হলেন। সময়টা তখন শীতের মধ্যভাগ। সেজন্য পথে তাঁকে ভয়ংকর শিলা-বৃষ্টি ও তুষার-ঝড়ে পড়তে হল।

তা সত্ত্বেও সেই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে তিনি সারাদিন চললেন। তাঁর পোশাক এত ভিজে গেল যে, তাঁর গায়েও জল গিয়ে লাগল এবং সন্ধ্যা নামবার সঙ্গে সঙ্গেই একখানি গ্রামে পৌঁছে আশা করতে লাগলেন, সেখানে কোথাও রাতের মত আশ্রয় পাবেন। বাঁশবনের মধ্য দিয়ে একটি বাড়ির জানালায় আলো জ্বলতে দেখে, তিনি সেইদিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলেন এবং সেখানে পৌঁছে দেখেন, একখানি খড়ের চালা, তার চারধারে বাঁশের নীচু বেড়া। তিনি বেড়ার দরজাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে ঘরখানির দরজায় ঘা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটি খুলে বেরিয়ে এলেন একটি লোক। সো-পো ঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে লোকটিকে নমস্কার করলেন।

তিনি বললেন—'আমি সুদূর উত্তর-পশ্চিমবাসী। আমার নাম সো-পো-তাও! আমি চু-রাজ্যে যাচ্ছি এবং পথে ঝড়-বৃষ্টিতে পড়েছি। জানি না কোথায় একটু আশ্রয় পাব। আমি প্রার্থনা করি, আপনি রাতের মত আমাকে এখানে একটু আশ্রয় দেবেন; তারপর ভোর হলেই আমি আমার পথে চলব। আমাকে একটু দয়া করবেন কি?'

এই কথা শুনে লোকটি সো-কে প্রতি নমস্কার করে, ঘরে ঢুকতে বললেন। সো ঘরের ভেতর ঢুকে দেখেন, একটি বড় বিছানা ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নেই। বিছানাটির ওপরে রয়েছে গ্রন্থের স্তূপ।

সো বুঝলেন, গৃহস্বামী পণ্ডিত লোক। সেইজন্য তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণামের উপক্রম করতেই লোকটি সো-কে মিনতির সঙ্গে নিরস্ত করে বললেন—'যতক্ষণ না আগুন জ্বালি, আপনি বিশ্রাম করুন।

তারপর আগুনে পোশাকগুলো শুকিয়ে নিয়ে দুজনে কথাবার্তা বলব।'

এই বলে তিনি কতকগুলো শুকনো কঞ্চি জড় করে আগুন জ্বালালেন এবং সো সেই আগুনে পোশাক শুকিয়ে নিলেন। তারপর গৃহস্বামী খাদ্য প্রস্তুত করে সেগুলো সো-র সম্মুখে রাখলেন এবং তাঁর সঙ্গে বড় সদয় ব্যবহার করতে লাগলেন। সে গৃহস্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে তিনি বললেন—'আপনার দাসের নাম, ইয়াং-চিয়াও-আই। আমার শৈশবাবস্থায় আমার পিতামাতার মৃত্যু হয়। আমি এখানে একা বাস করি। আমি বরাবর লেখা-পড়া নিয়েই আছি, চাষবাস কিছু করি না। আজ ভাগ্যের কৃপায় যদিও আপনি বহু দূরদেশ থেকে আমার এখানে এলেন, আবার বড় লজ্জা যে, আপনাকে এই সামান্য সামগ্রী দিয়ে অভ্যর্থনা করতে হল। প্রার্থনা করি, আপনি আমার এই দীনতা মার্জনা করবেন।'

পো তাও উত্তর দিলেন—'এই ঝড়ে আমি আশ্রয় পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। তার সঙ্গে আমি পাচ্ছি আহার্য ও পানীয়। আমি আপনার কাছে এতে এমন ঋণী হয়ে রইলাম যে সারা জীবনেও ভুলতে পারব না।'

সে রাতে দু'জনে একই বিছানায় একজনের পায়ের কাছে আর একজনের মাথা রেখে শুলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের জ্ঞানভাণ্ডার পরস্পরের কাছে উজাড় করে দিতে লাগলেন। কারো চোখেই সার রাতের মধ্যে একবারও ঘুম এল না।

পরদিন সকালেও তেমনিভাবে ঝড় বইতে লাগল। ইয়াং সেইজন্যে পো-তাওকে তাঁর কুটিরে রেখে, তাঁর সমস্ত আহার্য অতিথির সম্মুখে রাখলেন। অবিলম্বে দু'জনে পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলেন, এবং ইয়াং প্রথমে পো-তাওকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। কেননা, পো-তাও ছিলেন তাঁর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। এইভাবে তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে তিনদিন বাস করলেন। অবশেষে ঝড় শান্ত হল।

পো-তাও বললেন—'ভাই। তোমার এমন প্রতিভা আছে যে, তুমি রাজার প্রধান সচিব হবার উপযুক্ত। যদি এই বনে বাস করতে করতে তুমি বৃদ্ধ হয়ে পড়, তাহলে বড়ই দুঃখের কথা হবে।'

ইয়াং বললেন—'রাজকার্যের ভার নিতে যে আমার ইচ্ছা নেই তা নয়, কিন্তু আমি এ পর্যন্ত উন্নতির কোন সুযোগ পাইনি।'

পো-তাও উত্তরে বললেন—'চু-রাজ লোকটি বড় ধার্মিক; আর তিনি সকল দেশের পণ্ডিতদের তাঁর সরকারে পদ গ্রহণ করবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছেন। তোমার যদি সে রকম অভিপ্রায় থাকে তাহলে আমার সঙ্গে তাঁর রাজ্যে চল না কেন?'

'তোমার কথাই শিরোধার্য।' বলে ইয়াং কিছু টাকা-কড়ি নিয়ে তাঁর কুটীর থেকে পো-তাওয়ের সঙ্গে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু দু'দিন চলার পর আবার ঝড়-বৃষ্টি তাঁদের কাতর করে ফেলল; এবং দু'জনে একটি সরাইয়ে আশ্রয় নিয়ে, যে পর্যন্ত না কপর্দকশূন্য হলেন, সে পর্যন্ত সেইখানেই থাকলেন। তারপর তাঁদের পোঁটলাটি পালা করে কাঁধে নিয়ে, দু'জনেই সেই ঝড়েই আবার বেরিয়ে পড়লেন।

ঝড় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশেষে বৃষ্টিধারা ও শিলারাশি তুষারে পরিণত হয়ে সারাদিন ধরে পড়তে থাকল।

এই কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে দু'জনে লিয়াঙ পর্বতের মুখে একটি পথে এসে পৌঁছলেন। এইখানে একজন কাঠ কয়লা প্রস্তুতকারীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। সে বলল—'এই পথের শত ক্রোশের মধ্যে কোন বসতি নেই। এই পথ পার্বত্য ও নির্জন, জায়গায় জায়গায় গভীর বনের মধ্য দিয়ে গেছে; সেখানে বাঘ ও নেকড়ের দল ঘুরে বেড়ায়। আপনাদের আর অগ্রসর না হওয়াই উচিত।'

দুই বন্ধুতে তখন পরামর্শ করতে লাগলেন।

ইয়াং বললেন—'প্রবাদ আছে—জীবনে ও মরণে জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা যখন এতদূর এসেছি, তখন নিঃসংকোচে সম্মুখে অগ্রসর হই।'

এই সঙ্কল্প করে দু'জনে আরও একটি দিন পথ চললেন এবং রাত্রে একটি পুরাতন সমাধি-মধ্যে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাঁদের পোশাক-গুলো ছিল পাতলা; শীতের প্রচণ্ড শীতল বাতাস দেহ ভেদ করে হাড়ে গিয়ে বিঁধতে লাগল। পরদিন তুষার আরও ঘন হয়ে পড়তে লাগল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পার্বত্য প্রদেশকে এক ফুট গভীর তুষারে ঢেকে ফেলল। পো-তাওয়ের পক্ষে সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে উঠল অসহ্য।

তিনি বললেন—'বহু ক্রোশের মধ্যে কোন মানুষের বসতি নেই। আমাদের খাদ্যও শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে; আর এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা দূর করবার উপযুক্ত পোশাকও আমাদের নেই। যদি আমাদের মধ্যে কেউ একা চলতে থাকে, তাহলে সে চু-রাজ্যে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু দু'জনে এক সঙ্গে চলতে থাকলে দু'জনেই হয় অনাহারে, না হয় শীতে মারা পড়ব।...পর্বতের গায়ে ঘাসের মত আমরা বিনষ্ট হব—আমাদের দেখবার কেউ থাকবে না। তাতে আমাদের কি লাভ হবে? সেইজন্যে আমার সমস্ত পোশাক খুলে আমি তোমাকে দিই; তুমি সেগুলো পর এবং সমস্ত খাদ্য নিয়ে একাই অগ্রসর হও। আমার আর চলবার শক্তি নেই। আমার এখানেই মৃত্যু শ্রেয়ঃ। তুমি চু-রাজ্যে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা কর। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে তাঁর সরকারে কোন কর্ম দেবেন। তুমি তখন এখানে এসে আমার দেহটা খুঁজে বার করে সমাহিত করো। দেরী হলে কোনই ক্ষতি হবে না।'

চিয়াও-আই বললেন—'এই যুক্তির কি কারণ থাকতে পারে? আমরা একই পিতামাতার সন্তান না হলেও, পরস্পরের প্রতি আমাদের স্নেহ-ভালবাসা এত গভীর যে, সহোদর ভাইদের মধ্যেও এমন দেখা যায় না। উন্নতি লাভ করবার জন্যে আমি কি করে একা যেতে পারি?' এই বলে তিনি পো-তাওকে ধরে সেই ঘন তুষারের মধ্য দিয়ে বহু কষ্টে অগ্রসর হতে লাগলেন।

তারপর আরও ক্রোশ কয়েক গিয়ে পো-তাও বললেন—'তুষার

ঝড়টা আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, আমি আর অগ্রসর হতে পারছি না। পথের ধারে কোন আশ্রয় সন্ধান করা যাক।'

তাঁরা কাছেই একটা অনেককালের পুরানো কুলগাছ দেখতে পেলেন। গাছটার গুঁড়ি ফাঁপা। তার মধ্যে আশ্রয়ের একটু জায়গাও ছিল। কিন্তু স্থানটুকু ছিল মাত্র একটি লোকের উপযুক্ত। চিয়াও-আই, পো-তাওকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন; পো-তাও, চিয়াও-আইকে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে চকমকি জ্বেলে একটু আগুন করবার জন্য অনুরোধ করলেন। তাতে দু'জনে হাত-পা সেঁকে একটু গরম হতে পারবেন। চিয়াও-আই তাঁর অনুরোধমত শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখেন, পো-তাও নগ্ন দেহে রয়েছেন—এবং তাঁর সমস্ত পোশাক রয়েছে তুষারের ওপর জড় করা।

চিয়াও ভয়ে বলে উঠলে—'ভাই! একি?'

পো-তাও উত্তর করলেন—'এ ছাড়া আর উপায় নেই। তোমার নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না। আমার পোশাকগুলো পরে সমস্ত খাদ্য নিয়ে তুমি চলে যাও। আর আমি, এখানে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব।'

—'না। বরং আমরা দু'জনে একসঙ্গে মরব। কি করে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি?' বলে চিয়াও-আই, পো-তাওকে জড়িয়ে ধরে গভীর দুঃখে কাঁদতে লাগলেন।

পো-তাও বললেন—'ভাই! আমরা দু'জনে যদি মরি, কে আমাদের সমাহিত করবে?'

—'সত্য কথা। যদি একজনকেই যেতে হয়, তবে আমিই এখানে থাকি। তুমি আমার পোশাকগুলো পর; খাদ্যটা সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি মৃত্যুকে বরণ করে নেব।'

—'আমি নানা রোগে ভুগছি; কিন্তু তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট, আমার চেয়ে শক্তিমান। উপরন্তু আমার শিক্ষাদীক্ষা তোমার তুল্য নয়। সেইজন্যে আমি তোমার চেয়ে বাঁচতে অনুপযুক্ত। চু-রাজ্যের সঙ্গে

তোমার সাক্ষাৎ হলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে একটি উঁচু পদ দেবেন। আমার মৃত্যুতে কিছু হবে না। কাজেই আর বিলম্ব করো না।'

চিয়াও কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'এই কুলগাছের কোটরে তুমি ক্ষুধায় মারা যাচ্ছ, আর আমার হচ্ছে উপকার···এতে যে আমার সারা জীবন কলঙ্কিত হয়ে উঠছে। আমি যাব না।'

পো-তাও বললেন—'স্বদেশের পার্বত্যভূমি ছেড়ে প্রথম যে রাতে আমি তোমার কুঁড়ে ঘরে আশ্রয়ের জন্য গিয়েছিলাম, সেই রাতেই আমি তোমাকে প্রিয় বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি। উপরন্তু আমি জানি, তোমার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। সেইজন্যে আমি মিনতি করি, তুমি যাও। জগদীশ্বরের ইচ্ছাই এই যে, আমার এখানে মৃত্যু হবে।'

এই বলে তিনি তুষার রাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করতেই চিয়াও-আই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর গায়ে পোশাকগুলি জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে গাছের কোটরে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। পো-তাও তাঁকে সরিয়ে দিলেন; আবার, চিয়াও-আই তাঁকে রক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই সময় তিনি পো-তাওয়ের দেহে এক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন, পো-তাওয়ের হাত পা সাদা এবং অসাড় হয়ে গেছে, তিনি আর কথা বলতে পারছেন না। পো-তাও হাত নেড়ে, তাঁকে শেষবারের মত চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন, এবং চিয়াও-আই শেষবারের মত বন্ধুকে পোশাকে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নেই—শীতে পো-তাওয়ের হাত পা জমে গেছে, শরীরের মেদমজ্জা পর্যন্ত বিদ্ধ হয়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

চিয়াও-আই ভাবলেন—'আমিও যদি এখানে থাকি, তাহলে আমিও মারা যাব। তাহলে আমার প্রিয় বন্ধুকে কে সমাহিত করবে।'

তিনি তাই জানু পেতে বসে পো-তাওকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সজল চোখে বললেন—'তোমার অধার্মিক ছোট ভাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমি প্রার্থনা করি, তোমার আত্মা যেন তাকে রক্ষা করে।

আমি যদি একটি সামান্য কর্মও পাই, তাহলেও ফিরে এসে তোমাকে মহা আড়ম্বরে সমাহিত করব।'

পো-তাও যেন সম্মতি জানাবার জন্যে মাথাটি ঈষৎ নত করলেন। তারপরই তাঁর জীবনের অবসান হল।

তখন চিয়াও-আই তাঁর বন্ধুর পোশাকগুলি পরে, খাদ্যগুলি হাতে তুলে নিলেন। তারপর বন্ধুর প্রাণহীন দেহটির দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।

অবশেষে চিয়াও-আই অসাড় প্রায় দেহে, অনশনে মৃতপ্রায় হয়ে চু-রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি একটি সরাইয়ে সেদিন বিশ্রাম করে পরদিন নগরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন, চু-রাজ সত্যই পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করেছেন। রাজা রাজপ্রাসাদের তোরণের একধারে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণের জন্য একটি অতিথিশালা নির্মাণ করেছেন। পণ্ডিতরা প্রথমে সেখানে গিয়েই ওঠেন—এবং তাঁদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থার ভার আছে পি-চাঙ্ নামে একজন উচ্চপদস্থ অমাত্যের উপর। চিয়াও-আই যদি সেখানে যান, তাহলে রাজার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে।

চিয়াও-আই সেই কথা শুনে অতিথিশালায় চলে গেলেন এবং যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন, মন্ত্রী পি-চাঙ্ তাঁর গাড়ি থেকে নামছেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিবাদন করলেন।

মন্ত্রী দেখলেন, লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ মলিন হলেও মুখে প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যভিবাদন করে, চিয়াওকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

চিয়াও-আই উত্তর করলেন—'আপনার অনুগত ভৃত্যের নাম, ইয়াং চিয়াও-আই, নিবাস ইয়ুঙ্ চৌ। আপনাদের এই সম্মানিত দেশের জন্য পণ্ডিত আবশ্যক শুনে এসেছি।'

পি-চাঙ্ তৎক্ষণাৎ চিয়াও-আইয়ের বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং পরদিন এসে তাঁর সঙ্গে পুস্তকাদির বিষয় আলোচনা করতে

করতে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। চিয়াও-আই অবিলম্বে সেগুলির এমন চমৎকার উত্তর দিলেন যে, মন্ত্রী খুব খুশী হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি রাজার কাছে গিয়ে চিয়াও-আইয়ের আগমন-বার্তা নিবেদন করতেই রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে দর্শন দিলেন।

রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'আমার দেশ কি করে ধনশালী হয়ে উঠতে পারে এবং সেই সঙ্গে সুদক্ষ সেনাবাহিনী রাখাও দেশের পক্ষে সম্ভব?'

চিয়াও-আই তার যে দশটি উত্তর দিলেন, তাতে রাজা এমন খুশী হয়ে উঠলেন যে, অবিলম্বে চিয়াও-আইয়ের সম্মানের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করতে আদেশ দিলেন। তারপর তিনি তাঁকে রাজ্যের সহকারী সচিবের পোশাক, পদ ও একশত স্বর্ণমুদ্রা ও জরির কাজ-করা কয়েক থান মখমল দান করলেন। এতে চিয়াও-আই ভূমিষ্ঠ হয়ে রাজাকে প্রণাম করবার সময়, তাঁর চোখ ফেটে জল এল। তিনি কাঁদতে লাগলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কাঁদছেন কেন?'

চিয়াও-আই রাজার কাছে তাঁদের দুই বন্ধুর বিষয় সমস্ত বর্ণনা করে বললেন—'আমারই সুখের জন্য সে তার পোশাক, খাদ্য ও প্রাণ দিয়েছে—'

এই কথা রাজার অন্তর স্পর্শ করল, সভাসদ্ সকলেই অভিভূত হয়ে পড়লেন।

রাজা তখন পো-তাওকে তাঁর সহকারী সচিবের পদে নিযুক্ত করে তাঁর দেহ সমাহিত করবার জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা মঞ্জুর করলেন।

তারপর চিয়াও-আই লোকজন নিয়ে সেই পার্বত্য প্রদেশের সেই জায়গাটিতে এসে দেখলেন, তাঁর প্রিয় বন্ধুর দেহটি কুলগাছের কোটরে তেমনি অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

তিনি দেহটিকে সেখান থেকে পর্বত-পরিবেষ্টিত একটি সুন্দর ঝরনার সম্মুখে নিয়ে গিয়ে মহা আড়ম্বরে সমাহিত করে সেখানে একটি দেউল

নির্মাণ করে দিলেন।

তবু তিনি মনে শান্তি পেলেন না···বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য একদিন তিনি আত্মহত্যা করে পরলোকে চলে গেলেন।

এই সংবাদ রাজার কাছে পৌঁছল। চিয়াও-আইয়ের বন্ধু-বাৎসল্যে মুগ্ধ হয়ে একজন উচ্চপদস্থ অমাত্যকে তাঁর অন্ত্যেষ্টির জন্য সেখানে পাঠিয়ে দিলেন।

অমাত্য গিয়ে চিয়াও-আইকে বন্ধুর পাশে সমাহিত করলেন এবং রাজার আদেশে সেই সমাধির উপর একটি মন্দির নির্মাণ করে তার গায়ে একখানি কাষ্ঠফলকে ক্ষোদিত করে দেওয়া হল—'আত্মত্যাগ ও প্রেমের উদ্দেশে।'

লছমন

নরেন্দ্র দেব

বাবা সরকারি দপ্তরে বড় চাকরি করতেন। হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন। আমরা গোয়াড়ী থেকে একেবারে গোরক্ষপুরে এসে পড়লুম। আমাদের বাড়ির বাঙালি চাকর হরিচরণ দেশ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এতদূর আসতে চাইলে না। চাকরী ছেড়ে দিলে। কাজেই, এখানে এসে একজন নূতন চাকর রাখা হল। তার নাম—লছমন। সে হিন্দুস্থানি। গোরক্ষপুরেই তার বাড়ি।

লছমনকে রাখবার সময় মা তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে নিলেন —'এই তোম্ হাম্‌লোক্‌কো বাঙালি বাত্ বুঝ্‌তে করতে পারতা হ্যায়?' মা আমার এর চেয়ে ভালো হিন্দি বলতে পারতেন না। মা'র সেই না হিন্দি না বাংলা কথা শুনে লছমন তার পাগড়ি বাঁধা মস্ত মাথা নেড়ে মাকে এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললে—'হাঁ হুজুর!' মা খুশী হয়ে তাকে রাখলেন।

কিন্তু, প্রথম দিনেই টের পাওয়া গেলো যে—সে বাংলা মোটেই বোঝে না। তবুও মা তাঁর সেই 'না-হিন্দি না-বাংলা' কথাতেই তাকে নিয়ে কাজ চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাংলা কথা শেখাতেও সুরু করে দিলেন তাঁর কাজের সুবিধে হবে বলে।

লছমন ছিল খুব চটপটে। চক্ষের নিমিষে সে সব কাজ করে ফেলত। খুব খাটতে পারত সে। ইঁদারা থেকে ঘড়া ঘড়া জল

তোলা, বাট্‌নাবাটা, বাসন মাজা, সাবান দিয়ে কাপড় কাচা, ঘর দোর ঝাড়া-মোছা, বিছানা করা, বাবার তামাক সাজা—সব কাজ সে একা করতো।

কিন্তু মুস্কিল বাধলো তার ওই বাংলা কথা না বুঝেও—বুঝতে পেরেছি বলায়। কারণ, মা তাকে যখনি যা কিছু ফরমাইস করতেন তখনি এই কথাটাও জিজ্ঞাসা করতেন—'বুঝতে করতে পার্‌তা হ্যায়?' লছমনও তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে লম্বা সেলাম ঠুকে বলতো—'হাঁ হুজুর!'

একদিন মা তাকে একটা টাকা ভাঙাতে দিয়ে তাঁর সেই হিন্দি ভাষায় বললেন—'এই রূপিয়াকা ভাঙায়কে নিয়ায়।' লছমন তৎক্ষণাৎ সেলাম ঠুকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। খানিক পরেই মস্ত বড় একটা কাগজের ঠোঙা হাতে করে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলে—'ইয়ে কি আভি পিশ্‌নে হোগা?'

মা বললেন—'নেই—নেই। বাটনা ত' সব বাটা হয়ে গেছে। আর তো কিছু মস্‌লা পিশ্‌নে নেই হোগা। তোম্ যাও ওই টাকাকা ভাঙিয়ে লেআও।

লছমন সবিনয়ে বললে—'রূপেয়াকা তো ভাঙা লে-আয়া মাইজী।'

মা বললেন—'কই দে। রেজকি এনেছিস্ ত? না সব পয়সা? ষোল অনা গুণকে আনা হ্যায় ত'?'

লছমন সেলাম ঠুকে সেই কাগজের ঠোঙা মা'র হাতে তুলে দিয়ে বললে—'হাঁ হুজুর! ষোলো আনাকে পূরা ভাঙা লেআয়া।' বলেই সে কাগজের ঠোঙাটা আবার এগিয়ে ধরলে মা'র সামনে। সেটা হাতে নিয়ে মা দেখলেন—তাঁর লছমন চাকর এক ঠোঙা ঠাসা 'সিদ্ধি' কিনে এনেছে এক টাকা দিয়ে। মা ত' রেগেই খুন! মাথা কপাল চাপড়ে বাবার কাছে গিয়ে বলে দিলেন যে, লছমনকে তিনি একটা টাকা ভাঙাতে দিয়েছিলেন, সে এক টাকার সিদ্ধি কিনে এনেছে!

বাবা শুনে খুব হেসে উঠে বললেন—'ঠিকই করেছে! এদেশে যে

ওরা 'সিদ্ধি'কে ভাঙ বলে জানো না? তুমি ওকে এক রূপেয়া ভাঙাতে বলেছো—ও বুঝেছে তুমি এক রূপেয়ার ভাঙ আনতে বলছো।' মা শুনে অবাক! সিদ্ধিকে এরা ভাঙ বলে!

লছমন বাজার করতে গিয়ে আরও অনেকবার এই রকম ভুল করে মা'র কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল। দু'চারটে ঘটনা আমার আজও মনে আছে। একবার আমার খুব অসুখ হয়েছিল। ডাক্তার বেদানার রস খেতে দিতে বলে গেলো। মা তৎক্ষণাৎ লছমনকে ডেকে বেদানা আনতে দিলেন। বার বার বলে দিলেন যেন বেশ বড়ো দেখে বেদানা নিয়ে আসে; কারণ রস তৈরি হবে।

লছমন 'জো হুকুম!'—বলে সেলাম ঠুকে ঝাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে সদর বাজার ঘুরে আমার জন্য বেশ বড় দেখে একটা তামার 'বদ্‌না' কিনে এনে হাজির করেছিল।

আর একবার দিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে আমাদের জামাইবাবু এসেছিলেন গোরক্ষপুরে বেড়াতে। তখন ডিসেম্বর মাস, খুব কন্‌কনে শীত। মা জামাইবাবুর জলখাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গোরক্ষপুরে সন্দেশ পাওয়া যায় না—বরফি পাওয়া যায়। মা লছমনকে পয়সা দিয়ে বেশ করে বুঝিয়ে বলে দিলেন—'খাস্তার কচুরি, টাট্‌কা সিঙাড়া, কালাকাঁদ বরফি, অমৃতি জিলিপি, বালুশাই গজা, বড় বড় দরবেশ—এই সব খাবার হিঁয়া যা মিলতা হায় তাড়াতাড়ি লে আও!'

লছমনও সেলাম ঠুকে 'জো হুকুম হুজুর!'—বলে এক লাফে বেরিয়ে চলে গেলো। অন্যদিন সে দোকানে যায় আর ছুটে চলে আসে। একটুও দেরি করে না। সেদিন কিন্তু লছমনের আর দেখা নেই! বিকেল ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। জামাইবাবুর জলখাবার দিতে দেরি হচ্ছে। মা একেবারে অস্থির হয়ে ঘরবার করছেন, কিন্তু লছমন আর ফেরে না!

ক্রমে, সন্ধ্যে যখন বেশ ঘনিয়ে এলো, দোকানে দোকানে আলো

আলা হতে সুর হয়েছে, লছমনের ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই মনে করে, মা যেই স্টোভ জ্বেলে ঘরেই জামাইবাবুর জন্য হালুয়া-লুচি তৈরি করে দেবার যোগাড় করেছেন, এমন সময় বাইরে থেকে লছমনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, আয়োজন কাকে যেন সে খুব খাতির করে বলছে—'আইয়ে জনাব আলি অন্দরমে আইয়ে—'

একটু পরেই লছমন সব জিনিসপত্র নিয়ে ভিতরে এলো। মাথায় একটা কলসি। সঙ্গে তার প্রকাণ্ড দাড়িওয়ালা আলখাল্লা পরা একজন মুসলমান ফকির। মা তাকে এত দেরি করে ফিরে এলো কেন জিজ্ঞাসা করতেই লছমন লম্বা সেলাম ঠুকে করুণ কণ্ঠে জানালে যে দরবেশ আনতে তাকে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল। তাই দেরি হল। শহরের চারদিক সে খুঁজেছে—কোথাও দরবেশ মেলেনি। শেষে, একজন ভুঁজাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে সে তাকে বাতলে দিলে যে শহরের বাইরে ইমামবাড়িতে পাওয়া যাবে।

মা তাকে বাধা দিয়ে ধমকে উঠে বললেন—'দরবেশ পাওয়া গেল না ত' ফিরে এলিনে কেন? শহরের বাইরে তোকে কে যেতে বলছিল। আমি না তোকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে দিয়েছিলুম?'

লছমন আবার ঘাড় নেড়ে সেলাম ঠুকে বললে—'হাঁ হুজুর! হুকুম তামিল! আচ্ছা তাড়িভি লেআয়া!' তারপর সে মাকে বুঝিয়ে বলতে গেলো যে শহরের বাইরে গেলেও এত দেরি তার হত না; কিন্তু কি করবে সে—পথে নমাজের সময় হয়ে গেলো, তাই দরবেশ সাহেব দোয়া করে নমাজ পড়তে বসলেন, অগত্যা তার ফিরতে দেরি হল। শুধু তাড়ি কেন—সব জিনিসই সে গুছিয়ে এনেছে—বলে মাথার উপর থেকে মস্ত এক তাড়ির ভাঁড় মা'র সামনে রকের উপর নামিয়ে দিলে।

মা ত' রেগেই খুন! 'তাড়ি আনতে তোকে কে বলেছিল? আমি তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলুম'—বলে গালাগালি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা

করলেন—'খাবার কই রে মুখপোড়া গাধা। তোকে যে জামাইবাবুর জন্যে টাট্‌কা সিঙাড়া, কালাকাঁদ, বর্‌ফি, বালুশাই, গজা সব আনতে দিয়েছিলুম—কই সে সব?'

লছমন মস্ত এক সেলাম ঠুকে বললে—'সবকুছ লে-আয়া হুজুর!'—তারপর তার গামছার একটা ভিজে কোণের গাঁট খুলে বার করে দিলে সেই পৌষমাসের শীতে করাতের গুঁড়োমাখা এক ড্যালা বরফ! বললে—'লিজিয়ে হুজুর কলকা—বরফ-ইয়ে!' তারপর অতি সন্তর্পণে ট্যাঁক থেকে একটা কাগজে মোড়া গাঁজার পুরিয়া বার করে দিয়ে বললে—'ইয়ে লিজিয়ে হুজুর, জামাইবাবুকা আস্তো বালাশ্বরকা গাঁজা!' তারপর গামছার আর এক কোণ খুলে একরাশ পানফল রকের উপর ঢেলে দিয়ে বললে—'ইসসে বঁড়িয়া তাজা সিঙাড়া আউর নেহি মিলা, হুজুর!' পরে তার পিছনে যে ফকির সাহেব এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল এইবার তাকে এক সেলাম ঠুকে মা'র কাছে এগিয়ে এনে বললে—'ইয়ে দেখিয়ে হুজুর, আপকা দরবেশ ভি হাজির! বহুৎ তক্‌লিফ্‌সে ইন্‌কো মিলা!—'

জামাইবাবুর জলখাবার থেকে ভাগ পাবার লোভ যে আমাদের মনে মনে ছিল না—এ কথা বলতে পারবো না; কিন্তু লছমন যে এমন কাণ্ড করবে তা'—মা কেন—আমরাও কেউ স্বপ্নে ভাবিনি। এদেশে পানফলকে যে এরা 'সিঙাড়া' বলে, সেদিন প্রথম জানলুম। কোথায় কালাকাঁদ, বরফি আসবে, তা না লছমন কিনে নিয়ে এলো কিনা—এই শীতে কল্‌কা বরফ! বালুশাই, গজার বদলে নিয়ে এলো কিনা—বালেশ্বরের গাঁজা! দরবেশ মেঠাই—ওকি ও বেটা কখনো খায়নি? নিয়ে এলো কিনা এক লম্বা দাড়িওয়ালা ফকির সাহেবকে ধরে! মা বলে দিলেন ওকে তাড়াতাড়ি আসতে—আর ও নিয়ে এলো কিনা এক ভাঁড় তাড়ি! ভয়ানক রেগে উঠে মা যখন লছমনকে 'দূর হ—বেরো—এখনি বিদেয় হয়ে যা—' বলে বকছেন, সেই সময় বাবা বাড়ির ভেতর এসে পড়লেন। মাকে বললেন—'একটা পান দাওতো শীগ্‌গির! মুখটা

কেমন জেতো বোধ হচ্ছে।'

লছমন শুনতে পেয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে এক সেলাম ঠুকে 'জো হুকুম!'—বলে ছুটে গিয়ে এক বালতি জল এনে বাবার সামনে ধরলে। বাবা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'ইয়ে কোন্ তুমকো লেয়ানে বোলা?' লছমন সেলাম ঠুকে বললে—'আভি ত' আপ্ এক টব পানি মাঙা মা জীসে!—'

বাবা লছমনের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে মা'র দিকে ফিরে চাইতেই মা তাঁর সব রাগ ভুলে গিয়ে একেবারে খুব খানিক হেসে উঠে বললেন—'হাড় জ্বালাতন করলে তোমার এই হতভাগ্য চাকর! একটা পান চাইলে তুমি আমার কাছে,—ও তাই শুনে দৌড়ে গিয়ে এক টব পানি হাজির করেছে তোমার সামনে! এইতেই তুমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছ!—আর এদিকে একবার দেখ কী কাণ্ড!—'

তারপর সেই দাড়িওয়ালা দরবেশ থেকে আরম্ভ করে তাড়ির ভাঁড় ও বালেশ্বরের গাঁজা সবই একে একে মা দেখালেন তাঁকে। কলের বরফ প্রায় গলে এসেছে।

সেই রাত্রেই দরবেশকে নগদ কিছু বখশিস্ দিয়ে বিদেয় করে, বাবা লছমনকে জবাব দিলেন।

বড় কুটুম্ব

জরাসন্ধ

পরীক্ষায় প্রায় সব বিষয়েই ৭, ৫ পেয়ে, নম্বরের লিষ্টিখানা হাতে করে, সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মনোজ স্কুল থেকে বাড়ী ফিরল। গেলবারেই তার বাবা বলে রেখেছেন যে পরীক্ষার ফল ভাল না হলে এবার তাকে দোকানে বসতে হবে। তার বাবা একেবারে এক কথার লোক। মনোজ বুঝলো মুদির দোকানে তাকে যেতেই হবে। মা নেই যে একবার কান্নাকাটি করে দেখবে। থাকবার মধ্যে আছে এক মাসতুতো দিদি। কিছুদিন ওরা বর্ধমানে বদলি হয়ে এসেছেন। এসেই তাকে যাবার জন্যে লিখেছেন। সেখানে গেলে কেমন হয়? বর্ধমান জেলা বেশ জায়গা, সীতাভোগ, মিহিদানার দেশ। সেখানে পড়লে বেশ হয়। সেখানকার মাস্টার মশাইরা নিশ্চয়ই এখানকার স্যারেদের মতো এত কৃপণ নয়, কাঠখোট্টাও নয়।

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে উঠেই চট্ করে জামাটা পরে সে বেরিয়ে পড়ল, অন্য সকলে উঠবার আগে। বড়বাজারের কাছেই তাদের বাসা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে হাওড়া স্টেশনে এসে পড়ল।

তিন নম্বর প্লাটফরম থেকে তখন একটা গাড়ি ছাড়ছে। গেটে

টিকিট চেকার টিকিট দেখছেন। মনোজ জিজ্ঞেস করল—এ গাড়ি কোথায় যাবে, স্যর।

চেকার বললেন—বর্ধমান।

ঠিক সেই সময়ে কতকগুলো লোক এসে পড়ল, একগাদা লটবহর নিয়ে। চেকার তাদের নিয়ে ব্যস্ত—সেই ফাঁকে আস্তে পাশ কাটিয়ে মনোজ ছুটে গিয়ে গাড়িতে চড়ল, গার্ডসাহেবও বাঁশিতে ফুঁ দিলেন।

শ্রীরামপুর ছাড়তেই এক চেকার দেখা দিলেন। মনোজের বুকটা কেঁপে উঠলো। 'টিকেট। টিকেট।' সবাই টিকেট দেখাচ্ছে। ক্রমে মনোজের পালা এসে গেল।

টিকেট !—

মনোজ পকেটে হাত দিয়ে কি ভাবল। তারপর হঠাৎ বলল—ও-ও টিকেট ? ঐ ওঁর কাছে আছে—বলে গাড়ির ওপাশে এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিল।

চেকার তার কাছে গিয়ে মনোজের টিকেট চাইল।

ভদ্রলোক—তাঁর নাম দিনেশবাবু—প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন—কার কথা বলছেন ? আমার সঙ্গে তো আর কেউ নেই।

—আজ্ঞে, আমি ঐ ছেলেটির কথা বলছি। ও যে বললে, আপনার কাছে ওর টিকেট আছে। এই খোকা, ইনি তোমার কে হন ?

মনোজ গোটা দুই ঢোঁক গিলে বলে ফেলল—উনি আমার ভগ্নীপতি।

দিনেশবাবু রীতিমত ক্ষেপে উঠলেন—কি। আমি ওর ভগ্নীপতি। জীবনে ওকে চোখে দেখিনি মশাই। জোচ্চোর। রীতিমত জোচ্চোর। ওকে পুলিশে দেওয়া দরকার।

একজন দুধওয়ালা সবাইকে ঠেলে সামনে এল। রগড় দেখে দু' চারজন লোকও এগিয়ে এল। সবাই বলে—পয়সাটা দিন ফেলে মশাই—জোচ্চোর যে কে, সেকথা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। ছিঃ ছিঃ। দুটো পয়সা বাঁচাবার জন্যে নিজের শালাকে বলছেন কেউ না ?

আচ্ছা ভদ্দরলোক।

সবার দিকে চেয়ে কাতরভাবে দিনেশবাবু বললেন—আপনারা বিশ্বাস করুন, সত্যিই ও ছেলেটা আমার কেউ নয়।

ডেভিড কোম্পানীর অরুণবাবু ছিলেন ডান পাশে, বললেন—এতগুলো লোকের কাছে ধরা পড়ায় আপনার লজ্জা হচ্ছে না, এটাই আশ্চর্য। চেকার বললে—ওসব কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। আপনি ওর ভাড়া আর জরিমানা দেবেন কিনা বলুন। না দেন তো ওকে পুলিশে যেতে হবে।

অরুণবাবু বললেন—তা কখনও হতে পারে না। ওঁর দোষে ঐ ছেলেমানুষ জেলে যাবে? ভাড়া আমরা দিয়ে দিচ্ছি, তবে ভগ্নীপতিটিকে আমরা একবার দেখে নেব।

চার-পাঁচজনে সায় দিলে। গয়লাটা বলল—নিন, আমি দিচ্ছি এক টাকা। দিনেশবাবু একবার তাঁর কুড়িয়ে-পাওয়া বড় কুটুম্বের দিকে, আর একবার রুখে-যাওয়া জনতার দিকে চেয়ে পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিলেন চেকারের দিকে—নিন মশাই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে অনেক দণ্ডই দিতে হয়। কিন্তু রাস্তার লোকের ভগ্নীপতি সাজতে হবে—এতটা আশা করিনি।

বর্ধমানে গাড়ি থামল। সবাই নামছে। মনোজকেও নামতে হল। কোথায় তার দিদির বাড়ি সে জানে না।

অরুণবাবু এসে বললেন—কি খোকা, তোমার জামাইবাবু যে চলে গেলেন। তুমি যাচ্ছ না? সঙ্গে সঙ্গে না গেলে আবার টিকিট চাইবে। অগত্যা আবার টিকিট বিভ্রাটের ভয়ে সে এগিয়ে চলল এবং গেট পার হতে কোন বেগ পেতে হল না।

অরুণবাবু কাছেই ছিলেন। 'এসো খোকা, আমার সঙ্গে তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। ভয় কি।'—বলে জোরে জোরে পা ফেলে দিনেশবাবুকে ধরলেন।

শ্যালকটিকে একা ফেলে চলে এলেন? আপনার তো বেজায়

রাগ দেখছি।

দিনেশ—দেখুন, আমি একশবার বলছি, এটি আমার শ্যালক নয়। তবু আপনারা আমার পিছু নিয়েছেন কেন বলুন তো?

অরুণ—আহা-হা, চট্‌ছেন কেন মশাই। আগে বাড়ি চলুন, তারপর সব বোঝা যাবে।

বৈঠকখানায় ঢুকে দিনেশবাবু ওদের বসিয়ে বললেন—এবার বলুন তো আপনাদের মতলবটা। আপনারা কি চান? টাকা আমি আর দেব না।

অরুণবাবু বললেন—আজ্ঞে না, টাকা চাই না; এবার উঠতে চাই। যাও খোকা, বাড়ির ভেতরে যাও।

চেঁচামেচি শুনে বাড়ির ছেলেরা এসে আগেই জুটেছিল। এবার পরদার ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরে তাদের মায়ের আঁচলটাও দেখা গেল।

দিনেশবাবুর মেয়ে এসে বলল—বাবা, মা ওকে ভেতরে যেতে বলছেন।

দিনেশবাবু রুক্ষভাবে বললেন—কেন?

—দরকার আছে।

মনোজকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল। সে একবার মহিলাটির মুখের দিকে চেয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে বলল—দিদি, তুমি।

দিদি তার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন—হ্যাঁরে, তুই কোত্থেকে?

দিনেশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—চিনতে পারছ না? এ যে আমাদের মনোজ—ছোট মাসীমার ছেলে।

দিনেশ তো একেবারে হাঁ। মিনিট তিনেকের মধ্যে খেয়াল হল না এবার মুখ বোজা দরকার।

তারপর?—তারপর অরুণবাবু মস্ত বড় ভোজ খেয়ে বাড়ী ফিরলেন।

দাওয়াই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কেষ্টগোপালবাবুকে লোকে বলে কাষ্ঠগোপাল।

অকারণে বলে না। একটা মিষ্টি কথা বলবারও অভ্যেস নেই ভদ্রলোকের। কারণে অকারণে লোককে যা-তা বলে তাদের মন খারাপ করে দিতে তিনি ভয়ানক ভালবাসেন।

এই ধরো পটলা অঙ্কে ফেল করে ক্লাশে প্রমোশন পেল না। তিন দিন ধরে ছেলেটা খালি কেঁদেছে, তাকে দেখলে সকলেরই দুঃখ হয়, কেবল কাষ্ঠগোপালের হয় না। পটলাকে আরও কষ্ট দিয়ে মনে মনে তিনি ভারী আরাম পান। বাজারের ভেতর দিয়ে হয়তো পটলা যাচ্ছে, চারদিকে লোকজন, তার মধ্যে গলা চড়িয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন, কিরে পটলা, অঙ্কে নাকি তুই তিন পেয়েছিস?

পটলা যে দৌড়ে পালাবে তারও জো নেই। রাস্তা জুড়ে কাষ্ঠগোপাল দাঁড়িয়ে। অতলোকের সামনে ডুকরে কেঁদে ওঠবার উপায়ও নেই পটলার। লাভের মধ্যে যারা খবরটা জানত না, তারাও জেনে গেল। মিঠ মিঠ করে হাসতে লাগলেন কাষ্ঠগোপাল।

বিশ্বনিন্দুকে লোক। কিছু পছন্দ হয় না কাষ্ঠগোপালের। পাড়ায় কোনো বাড়ীতে বিয়ে-টিয়ে হলে ভদ্রতার খাতিরেও তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে

হয়। আর খেতে বসে কী করেন কাষ্ঠগোপাল ?—আরে ছ্যা, এর নাম লুচি ? এ যে জুতোর চামড়া হে। পচা ভেজিটেব্‌ল ঘি জোটালে কোত্থেকে ? রাম-রাম, এ রকম বাজে মাছের কালিয়া তো কখনও খাইনি। অ্যাঁ—এগুলো রসগোল্লা নাকি ? তাহলে আর সুজির পিণ্ডি কাকে বলে ?

কেউ যদি বলে, আমাদের তো ভালোই লাগছে—কাষ্ঠগোপাল তাকে ঠাট্টা করতে থাকেন। বলেন, পরের পয়সায় যে খাচ্ছ হে। জুতোর সুখতলাও অমৃতির মতো মনে হবে, মার্বেল খেতে দিলেও বলবে জনাইয়ের মনোহরা খাচ্ছি।

এই হলেন কাষ্ঠগোপাল। কিন্তু লোকে তাঁকে চটাতে সাহস পায় না। তাঁর অনেক টাকা, আর পাড়ার অর্ধেক বাড়ির তিনি মালিক।

পাড়ায় নতুন বাড়ি করে এসেছেন মার্তণ্ডবাবু। রাশভারী চেহারার লোক। কী যেন সরকারী চাকরী করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন। প্রায়ই বই-টই পড়েন আর সকালে-বিকালে একটা লাঠি হাতে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যান।

কাষ্ঠগোপাল গিয়ে হাজির হলেন তাঁর কাছে। নতুন লোক আলাপ তো করা চাই। তাছাড়া ফাঁক পেলে দুটো কড়া কথাও বলে আসবেন।

মার্তণ্ডবাবু একটা মস্ত চামড়া-বাঁধানো ডেক চেয়ারে বসে একটা ইংরিজি বই পড়ছিলেন। কাষ্ঠগোপালকে দেখে বইটা নামিয়ে বললেন, আসুন। বসুন।

—আলাপ করতে এলুম।

চশমার ভেতর দিয়ে তাঁকে ভালো করে দেখে নিলেন মার্তণ্ড। তারপর বললেন, বেশ।

একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাষ্ঠগোপাল বললেন. এ পাড়ায় বাড়ী করলেন কেন ?

—এমনি। ভালো লাগল।

—না মশাই, অতি নচ্ছার পাড়া। লোকগুলো খুব বাজে।

—তাই নাকি? আপনিও বুঝি খুব বাজে।

কথাটা শুনে একটা বিষম খেলেন কাষ্ঠগোপাল: না—না—ইয়ে—আমি বাজে লোক নই। পাড়ায় একমাত্র ভালো লোক আমাকেই বলতে পারেন।

মার্তণ্ড বললেন—শুনে সুখী হলুম। তা কী খাবেন? চা? না ঘোলের সরবৎ। কাষ্ঠগোপাল বললেন, বড্ড গরম পড়েছে আজ। ঘোলের সরবতই ভালো।

মার্তণ্ড ঘোলের সরবৎ আনতে বলে দিলেন চাকরকে। কাষ্ঠগোপাল ভাবতে লাগলেন, এইবারে কী বলা যায়।

—অনেক খরচ করে বাড়ী করলেন মশাই কিন্তু ভালো হয়নি।

মার্তণ্ড বললেন, ভালো হয়নি বুঝি? সবাই তো প্রশংসা করছে বাড়ীর।

—ও তো মুখের প্রশংসা মশাই। এ আবার বাড়ীর একটা ডিজাইন নাকি? তা ছাড়া সব বাজে বাজে মাল-মশলা দিয়ে তৈরী মশাই, দেখবেন—এক বছরেই ফাট্ ধরে যাবে।

—ফাট্ ধরে যাবে?

যাবেই তো। কনট্রাকটাররা কী করে? যেমন-তেমন করে কেবল পয়সা আদায়ের ফন্দী। যা তা একটা তৈরী করে দিলেই হল।

—অ। —মার্তণ্ড আবার কাষ্ঠগোপালের দিকে তাকালেন: কিন্তু এ বাড়ী তো কনট্রাকটারে করেনি। আমার বড় ছেলে এঞ্জিনীয়র সেইই দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছে।

—ও—ও কাষ্ঠগোপাল একটু ঘাবড়ালেন: তা হলে মালমশলা ভালোই আছে। কিন্তু আপনি যাই বলুন ডিজাইনটা ভাল হয়নি।

কপাল কুঁচকে মার্তণ্ড কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন কাষ্ঠগোপালের দিকে।

আর এর মধ্যে চাকর ঘোলের সরবৎ নিয়ে এল।

চমৎকার সরবৎ। মশলা-টশলা দিয়ে অনেক যত্ন করে তৈরী—

নিন্দে করবার কিছু নেই। কিন্তু এক চুমুক খেয়েই নাক কুঁচকে উঠল কাষ্ঠগোপালের।

মার্তণ্ড বললেন—সরবৎ আপনার পছন্দ হয়নি বোধ হয়।

কাষ্ঠগোপাল বললেন, সত্যি কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। না—পছন্দ হয়নি। মার্তণ্ড শান্ত গলায় বললেন, কি রকম আপনার পছন্দ ?

—এ দই দোকান থেকে আনিয়েছেন তো ?

—আর কোথায় পাব ?

—তাই। আরে দোকানের দই কি আর দই মশাই, ও তো অর্ধেক চুনের গোলা।

বিনীত হয়ে মার্তণ্ড বললেন—তাহলে ভালো দই কোথায় পাব বলতে পারেন ?

—বলছি, শুনুন।—খুশি হয়ে কাষ্ঠগোপাল টেবিলে একটা চড় মারলেন : সে দই সে ঘোল খেয়েছিলুম আমার পিসিমার বাড়ীতে—হরিপালে। মানে তারকেশ্বর লাইনে যে হরিপাল আছে সেখানে।

মার্তণ্ড বললেন—বলে যান।

—আগের দিন গোরু দোয়ানো হল। সেই টাটকা দুধ ক্ষীরের মতো জ্বাল দিয়ে সন্ধ্যেয় দই পাতা হল। সেই দই থেকে পরদিন দুপুরে যখন ঘোল তৈরী হল—বাধা দিয়ে মার্তণ্ড বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। আমিই সে ঘোল খাওয়াতে পারি আপনাকে। একেবারে সেই জিনিস ? একেবারে কোন খুঁত পাবেন না।

বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মার্তণ্ড। কাষ্ঠগোপালকে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

কাষ্ঠগোপাল কেমন চমকে গেলেন।

—কোথায় যেতে হবে।

—আসুন বলছি।

বাপরে, কি গলায় আওয়াজ মার্তণ্ডের। পিলে চমকে গেল

কাষ্ঠগোপালের।

মার্তণ্ড আবার সেই বাঘাস্বরে বললেন, আসুন, শিগ্‌গির।

অগত্যা উঠে পড়লেন কাষ্ঠগোপাল। তাকে সোজা দোতলায় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট ঘরের দরজা খুলে দিলেন মার্তণ্ড। বললেন, ঢুকুন ওর মধ্যে।

—অ্যাঁ। ওখানে কী ?

—ঘোলের সরবৎ। আপনি যেমন চেয়েছেন। ঢুকুন।

প্রায় ঠেলেই কাষ্ঠগোপালকে ভেতরে ঢোকালেন মার্তণ্ড। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

বাজের মতো আওয়াজ তুলে মার্তণ্ড বললেন—আমার স্পেশাল সরবৎকেও আপনি নিন্দা করলেন। ঠিক আছে, আপনি যা চান তাই খাওয়াব।

—কিন্তু এ ঘরে সরবৎ কোথায় মশাই। মিস্তিরিদের কটা চুনের টিন, কটা বাঁশ—

—আসবে সরবৎ আসবে। আমি এখন হাটে লোক পাঠাচ্ছি, সন্ধ্যের মধ্যে সে লোক ফিরে আসবে। কাল দুধ দোয়ানো হলে—দই পাতা হবে। সেই দই থেকে পরশু দুপুরে ঘোল হবে। সেই ঘোল খেয়ে, তবে আপনি এ ঘর থেকে বেরুবেন, তার আগে নয়।

মার্তণ্ড চলে গেলেন। কাতরস্বরে চেঁচাতে লাগলেন কাষ্ঠগোপালবাবু, কেউ সাড়া দিল না।

ভাগ্যিস, ঘরের ছোট জানালাটায় শিক-টিক কিছু ছিল না। প্রাণের দায়ে সেইটে দিয়ে ঝাঁপ মারলেন কাষ্ঠগোপাল—পড়লেন একটা পচা ডোবার ভেতরে। ঘোলের বদলে একপেট কাদাজল খেয়ে তিনি উঠে পড়লেন, তারপর সেই যে ছুটলেন—

অলিম্পিকের দৌড়ও তার কাছে লাগে না।

———

কাউকে যদি বাঘে পায়

শিবরাম চক্রবর্তী

বাঘ যদি কাউকে পায় তো কী হয় সে কথা হয়ত না বললেও চলে। বাগে পেলেই সে আগে খায়, একথা কার অজানা ? কিন্তু না, সে-পাওয়া বলছিনে, কাউকে যদি বাঘে পায়—মানে, যেমন ফুটবলে পায়, সিনেমায় পায়, ডাক-টিকিট যোগাড়ের বাতিকে ধরে, তেমনি যদি কেউ বাঘের প্রতি স্নেহাসক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে···

তাহলে তেমন বাঘা মানুষের ত্রিসীমানায় যেতে নেই !

আর তেমনি ধারার মানুষ ছিলো আমাদের সিধু।

সুদূর আসামে তাদের চা-বাগান। সোজাসুজি না এলেও, ঘুরে ফিরেও সিধুর যে সব খবরাখবর আমাদের কানে আসতো তাতে আমাদের মাথার চুল সিধে হয়ে যেতো। সে নাকী জংলী জানোয়ারদের পোষ মানাবার মন্তর জানে, বাঘ ভালুকদের বশ করতে ওস্তাদ্, তারা নাকি তার হাত থেকে খায়, পায়ের কাছে পাপোষের মতন পড়ে থাকে ! একটা বাঘ ন্যাওটার মতই ওর পেছনে পেছনে ঘোরে নাকি !

কুকুরকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে ঘোরে, কিম্বা কুকুরের ল্যাজে বাঁধা পড়ে থাকে এমন বিস্তর লোক (এমন কি, বালকও), আমি দেখেছি,

কিন্তু বেঘোরে মারা পড়তে বনের বাঘকে নিজের লেজুড় কেউ বানিয়েছে এমন কথা ভাবতেই পারা যায় না! ভাবলেই পিলে চমকায়!

এবং তা চমকালো আরো ভালো করেই—সিধুর আমন্ত্রণে তার বাগানে গিয়ে।

'আমার নন্দিনীকে দেখবে এসো।' বলে সে বাড়ির মধ্যে ডাকলো আমায়।

অবাক্ হবার কথাই বইকি! খবর না দিয়ে এর মধ্যে কবে সিধু বিয়ে করলো, কবেই বা তার মেয়ে হোলো। বিয়ের প্রথম ভাগে যে মিষ্টিমুখের ব্যাপারে বাদ পড়েছি তার দ্বিতীয় ভাগে, নন্দিনী ভাগ্যে, মেয়ের মিষ্টিমুখ দেখে তার ক্ষতিপূরণ হবে কিনা সেই কথাই ভাবছি—ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভেতর পা দিতেই দেখি উঠোনের এক কোণে প্রকাণ্ড এক বাঘ! আঁৎকে তিন পা পিছিয়ে এলাম!

'আরে, কী বাজে ভয় খাচ্ছো! ওতো একটা বাচ্চা।' সিধু আমায় আশ্বস্ত করে।

'বাচ্—চা?' বলতে আমার দুবার দম নিতে হয়।

'বাঃ, বাঘের বুঝি বাচ্চা হয় না? বাঘ তো প্রথমে বাচ্চাই হয়। মানুষের মতন বাঘের দুগ্ধপোষ্য অবস্থা আছে, তাদেরো শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য হয়ে থাকে, তাদেরো নাবালক সাবালক অবস্থা আছে, তাদেরো পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে—ঠিক আমাদের মতই। ওকে বাঘ বলে বিবেচনা করো না, নেহাৎ ছেলেমানুষ!'

'নেহাৎ ছেলেমানুষ!' কথাটা সে বাঘকে না আমাকে কাকে লক্ষ্য করে বলল, সেই জানে! আমি আর বেশি জানার চেষ্টা করলাম না। তার কথায় একটি পা-ও আগালাম না আর।

'আরে ভয় কি! এসো এসো। যদিও একে নিতান্ত নাবালক আর বলা যায় না, সঠিক বললে কিশোরীই বলতে হয়, তবু এর থেকে তোমার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কিচ্ছুটি বলবে না। তোমাকে। এই···

এই আমার নন্দিনী।'

'এই নন্দিনী!' আমার পিলে আরেকবার চম্‌কায়।

'না ভাই, এখেনেই থাকি।' আমি বললাম। 'ওর থাবার নাগালে গেলে—কে জানে—না, নন্দিনী নন্দিনীই থাক, ওকে আরো বেশি আনন্দিনী করার সাধ নেই।'

'কিচ্ছু ভয় নেই। চলে এসো, চলে এসো! কিচ্ছু বলবে না তোমায়। কী মিষ্টি মেয়ে আমার নন্দিনী!' মুগ্ধকণ্ঠে সে বলে।

'না বলুক! নাই বললো! বলবার কী আছে আবার ওর? ওর তো মাত্র একটি কথা—হালুম্! আর সেই একবাক্যে সকলের ঘাড় মট্‌কানোই ওর কাজ। আমার ঘাড় এমনিতেই পল্‌কা! ঘাড়ের কোনো এক্সারসাইজ্ জীবনে করিনি তো। না ভাই, ওর কোনো কথার মধ্যে আমি রাজি নই।'

আধ-ভেজানো দরজার একটা পাল্লা হাতে করে চৌকাঠ ধরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—কাঠ হয়ে। ওর পাল্লায় এক পা-ও এগুলাম না আর। হালুম্ দূরে থাক্, নন্দিনী যদি একটু হাঁ করে, তাহলে তক্ষুনি দরজার শেকল টেনে হাওয়া হবো। ঘাড়ের ওপর মালুম হবার আগেই।

তখন তার কিশোরী নন্দিনীর কাছে সিধু একলাই এগিয়ে গেল। গিয়ে তাকে কোলে পিঠে করে আদর করতে লাগলো। আদর করে অপরকে বাগাতে হয়, তা জানি, কিন্তু বাঘকে কেউ নিজের মেয়ের মত আদর করছে এমন কথা স্বপ্নে দূরে থাক্, সার্কাসেও ভাবা যায় না। কদাচিৎ মানুষ-শিশুকে নেকড়ে-মা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে নেকড়ে-শিশু বানিয়েছে এমন খবর অবশ্যি পেয়েছি, খবরের কাগজের দৌলতেই পাওয়া; কিন্তু ব্যাঘ্র-শিশুকে নিয়ে (শিশু না হয়ে না-হয় কিশোরীই হোলো) এই নেকড়েপনা (বা মেয়ে নেকড়ানো) মোটেই আমার ভালো লাগে না। এ বোধহয় কাগজওয়ালাদের কল্পনার অতীত।

ওর এই ভালোবাসার ব্যাগ্রতা দেখে—দেখে দেখে আমি ভাবি, না, ভালোবাসা হচ্ছে সত্যিই অভাবিত। জিনিসটার আগাগোড়াই

রহস্যময়।

'ও কি হচ্ছে? করছো কী? পালিয়ে এসো।' দোরগড়ার থেকে আমি জোর গলায় হাঁকি: 'বাঘকে কি লাই দিতে আছে? লাই দিলে বাঘ মাথায় উঠবে। আর বাঘ যদি একবার মাথায় উঠে, তখন বাঘ আছে, তুমি নাই। আর, তুমি না থাকলে আমার কী হবে? আমায় কে দেখবে তখন এখানে? তোমা বিহনে এই বিদেশ বিভুঁয়ে আমার কী দশা হবে, কোন্ আতান্তরে পড়বো তা কি তুমি ভেবে দেখেচো?'

'পাগল! নন্দিনী আমার সে রকমের মেয়ে নয়! এ রকম মেয়ে—মানে বাঘ, প্রায় দেখা যায় না।'

'না যাক্! কিন্তু বাঘকে কি লোকালয়ে মানায়? বাঘের জায়গা হচ্ছে জঙ্গল। জঙ্গলে নিয়ে ওকে ছেড়ে দাও, নয়তো কোনো চিড়িয়াখানায়। মানুষের ঘরে—কিম্বা—মানুষের ঘাড়ে বাঘের কোনোই শোভা নেই। মানায়ও না।'

'তোমায় বলেছে!' বলে, নন্দিনীকে ও ঘাড় থেকে নামায়। ওর পিঠ চাপড়ে মাথা থাবড়ে চুমু খেয়ে আদরের চূড়ান্ত করে, তারপরে ও বেরয়। 'বাব্বা, তুমি যা ভীতু! কী ভয়কাতুরে! ছিঃ! চলো তোমাকে আমাদের বাগান দেখিয়ে আনি।'

ও বাঘ ছেড়ে বেরুলো, আমি হাঁপ ছেড়ে বেরুলাম। বললাম—'আদর দিয়ে ওর মাথা খাচ্ছো। কিন্তু প্রতিদানে ও যেদিন তোমার মাথা খাবে সেদিন তুমি থাকবে কোথায়।'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ও বললে—'আমাদের বাগান দেখলে তুমি অবাক হবে।'

ওর মোটরে চড়ে চললাম ওদের বাগান দেখতে। যেতে যেতে ওর মুখে নন্দিনীর গল্প শোনাও চললো।

'আসামের জঙ্গল থেকে ক'মাসের শিশু নন্দিনীকে ও নিয়ে আসে। কোন এক শিকারীর গুলিতে ওর মা নাকি মারা পড়েছিল। দেখাশোনা

করার কেউ ছিল না বেচারীর। আহা, দুধের বাছাটি! সেই থেকে নন্দিনী ওর কাছে আছে। ওর লালন-পালনে, যাকে বলে শশিকলার মতই, দিনে দিনে বর্ধিত হয়েছে।'

'এ পর্যন্ত একটা পোকামাকড়ের গায়েও তার হাত তোলেনি নন্দিনী। কী মধুর ওর স্বভাব, আর কী চমৎকার ওর চোখের চাউনি! আর তেমনই মিষ্টি কী ওর হাসি ভাই! হাসিটা চমৎকার হোলো কি করে জানো? নিমের দাঁতোন দিয়ে রোজ দাঁত মাজে বলে।'

'দাঁত মাজে?' বিস্ময়ে আমি হাঁ।

'মাজে কি? সহজে কি মাজতে চায়? মেজে দিতে হয়। আমিই মেজে দিই। ভাবছি এবার থেকে দাঁতনের বদলে টুথ্ পেইস্ট্ আর টুথ্‌ব্রাশ ব্যবহার করবো।'

'সাবাস্', বলতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে 'সাব্রাশ্' বেরোয়।

'তবে হ্যাঁ, হাজার ঠাণ্ডা হলেও, মাঝে মাঝে ওর মেজাজ দেখা দ্যায় বটে! তখন ও ছুটে বেরিয়ে পড়ে—বনের ডাকেই বোধ হয়। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এমন দৌড় মারে আর লাফঝাঁপ লাগায় যে, তাই দেখে চারধারের লোক ভয়ে ভিরমি খায়। সবাই অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু তাও বলবো ভাই, কারু গায়ে কখনো আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেনি ও।'

'কাজেই নন্দিনীর আঁচড়ন ভাল কি মন্দ তা ঠিক বলা যায় না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা বলে থাকে। ভারী ওরা 'সেপ্‌টিক্' নাকি। সিধু যতই আমায় অভয় দিক না, প্রাণ থাকতে ওর আঁচড়ের আওতায় আমি যাচ্ছিনে।'

ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, সিধু বলে—'আরে, এ ধারটা এত ফর্সা দেখছি কেন আজ? এমন ফাঁকা ফাঁকা যে! লোকগুলো সব গেল কোথায়?'

'কোন্ লোকগুলো?'

'চা-বাগানের কুলীদের বস্তি যে এই দিকটায়। কিন্তু তাদের কাউকে তো দেখছি না একদম। ছুটির দিন আজ—!'

'ছুটির দিনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে বোধ হয় !'

'আশ্চর্য ! ছুটির দিনে এসব রাস্তা কুলী-কামিনে ভরে থাকে যে। হাসিখুসি—খোসগল্পে জমজমাট। কিন্তু আজ এ কী ? এটা কিরকম হোলো ? মনে হচ্ছে কাছে পিঠে কোথাও কোনো ফুর্তি লেগেছে। সেইখানেই গেছে সবাই। কিন্তু আমি তো এর ভেতর ওদের কোনো পরবের কথা শুনিনি।' সিধু যেন একটু ভাবনায় পড়ে।

কিন্তু তার দুর্ভাবনা দূর হতে বেশিক্ষণ লাগে না।

নন্দিনী।

আমাদের মোটর-পথের মোড়টা ঘুরতেই অদূরে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বাঁকের মুখটাতেই।

ওই দৃশ্য দেখবার পর আশ-পাশের লোকদের অদৃশ্য হবার কারণ বুঝতে বেশি দেরি লাগে না।

পথের মাঝখানে কারো-পরোয়া-করিনে-ভঙ্গিতে নন্দিনী দাঁড়িয়ে। বেশ খাতির-নাদারৎ ভাব। হাতের থাবা দিয়ে রাস্তার মাটি আঁচড়াচ্ছে। আমাদের এগুতে দেখেও একটুও তার গেরাহ্যি নেই।

নন্দিনীর ঐ ভাব দেখে তো প্রাণ আমার উড়ে গেছে ? মনে হোলো এখনি বুঝি বা আমাদের মোটরের ওপর ও লাফিয়ে পড়ে। ভয়ে আমি কাঁপতে থাকলাম।

সিধুর কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

'না, একদম্ গোল্লায় গেছে। পাড়া বেড়ানো স্বভাব হয়েছে মেয়েটার। কিন্তু বাড়ির থেকে ও বেরুলো কি করে বলো তো! চেন্ খুললো কি করে।' এই বলে, নন্দিনীর কাছে গিয়ে সে মোটর থামালো।

আমি কিছু বলার আগেই (বলবার ছিলই বা কি ? বাধা দিলেই সে কি মানতো ?) সিধু মোটর থেকে নেমে গেছে—নন্দিনীর কাছেই সিধে। গিয়ে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে ফেলেছে আমাদের পিছনের সিটে। আর, নন্দিনী এই রাগে (এই আদরের

অত্যাচারেই হয়ত বা) গরগর করতে করতে মোটরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

এমন বিচ্ছিরি লাগে আমার। ছেলে বাঘই হোক্ আর মেয়ে বাঘই হোক্, দুগ্ধপোষ্য কিম্বা বুড়ো বাঘই হোক্ না, বাঘ হচ্ছে বাঘ। তার কিশোরী যুবতী বালিকা বলে কোন ভেদাভেদ নেই, অন্ততঃ মানুষের কাছে তো নয়! মানুষকেও নিশ্চয় তারা বিভিন্ন চোখে গ্যাখে না। পেলেই বাগায়। কোনো অপোগণ্ড বাঘের থাবা তার বাবার থাবানির চেয়ে বেশী মুখরোচক হবার কথা নয়, তার এক ঘা খেলে সাধ করে যে অপর গণ্ড বাড়িয়ে দেবে এমন আশা করিনে। নন্দিনীই হোক্ কি নন্দনই হোক্, ব্যাঘ্রকুলের কেউ আমার কাছে একটুও আনন্দের নয়।

মোটরের মুখ ঘুরিয়ে তখনই ফিরল সিধু—নন্দিনীকে নিয়ে। নন্দিনী যে ঠিক লক্ষ্মী মেয়েটির মত ঠাণ্ডা হয়ে মোটরে বসে থাকলো তা বলা যায় না। আঁচড়ে কামড়ে পেছনের সিটটা ছিঁড়ে তছ্‌নছ্‌ করলো —তারপরে তার ধ্বংসস্তূপের ওপর আর্ধেক বসে আর্ধেক দাঁড়িয়ে কেমন যেন জবুথবু হয়ে রইলো! বাঘের পক্ষে জবুথবু হওয়া সম্ভব নয়, বলতে হয় জবর থবর।

আমার সিটের মাথায় তার থাবা রেখে ঐ অবস্থায় সে খাড়া রইলো —আমার ঘাড়ের ঠিক ছ' ইঞ্চি পেছনে। তার গর্‌গরানি, গরম নিঃশ্বাস, লালার ছিট্‌কার আমার ঘাড়ে এসে লাগতে লাগল আর আমি দুর্গা নাম জপতে লাগলাম।

আর, কী গায়ের গন্ধ রে বাবা! দুর্গানামকেও ভুলিয়ে দেয়, বাঘরা যে এমন গন্ধমাদন হয় তা কে জানতো?

স্টিয়ারিং হাতে বলতে লাগল সিধু—ভালবাসায় বনের পশুও বশ মানে, শোননি তুমি? এই গ্যাখো তার প্রমাণ। আমার মধ্যেই তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। ঘরছাড়া দুষ্টু মেয়ে কেমন করে ভুলিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে হয় তাও গ্যাখো! সত্যি বলতে সম্মোহনী শক্তি আবার

কী ? ভালবাসারই অপর নাম। গান্ধীজী যাকে অহিংসা বলতেন,· তা কি ভালবাসা ছাড়া আর-কিছু। তুমি বাঘকে যদি না হিংসা করো, তার প্রতি কোনো বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করো যদি, তো বাঘও তোমাকে···তুমি কি বাঘেদের ঘৃণা করো ভাই ?

'ঘৃণা ? না না ? ঘৃণা করবো কেন ?' কম্পিত কণ্ঠে বলি : 'বরং তাদের শ্রদ্ধাই করে থাকি। (বলতে গিয়ে স্বরগ্রাম একটু বড়ো করার চেষ্টা করলাম, যাতে কথাটা বাঘটারও কানে যায়, তারপর গলা একটু খাটো করে) কিন্তু ভাব ঘৃণা নয়, ওদের আমি ঠিক বিশ্বাস করি নে।'

'ভুল, তোমার ভুল। বাঘরাও মানুষ। তাদেরো হাত-পা আছে। তারাও খায়-দায় ঘুমোয়। পায়চারি করে। প্রাণ আছে তাদেরো। আমাদের মত তারাও ভালবাসে, ভালবাসতে জানে। আমাদের মতই তারা ভালোবাসার পিয়াসী। তারাও আদর চায়, আদর করতে চায়।'

আদরের কথায় আমার টনক নড়লো আবার! নন্দিনীর হাবভাব আদুরে আদুরে কিনা ঘাড় বেঁকিয়ে আড়চোখে দেখতে চাইলাম। যদি আদর করে পেছন থেকে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তাহলেই তো গেছি! তার সমাদর আমার পক্ষে যমাদর! তার স্নেহের টেক্‌সো দিতে পারে আমার এই দেহ তেমনই টেকসই নয়। অন্তত:, সিধুর মত নয়।

এক এক মুহূর্ত মনে হতে লাগলো যেন এক এক যুগ। মোটর গাড়ি চড়ার শখ আমার চিরকালের—পরের মোটর হলে তো কথাই নেই। কিন্তু এমন নিদারুণ মোটর-যাত্রা জীবনে কখনও আমার হয়নি। যেন কখনও আর না হয়।

অনন্তকাল পরে আমরা সিধুর আস্তানায় ফিরলাম। মোটর থামতেই সিধু লাফিয়ে নামলো। আর আগের মতই, নন্দিনীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে, ঢুকলো বাড়ির ভেতর। আমি কিন্তু এক পা-ও

নড়লাম না। বসে রইলাম ওর মোটরেই। ঐখানে বসেই ওর অপেক্ষায় রইলাম।

বেশিক্ষণ বসতে হোলো না। দরজার আড়ালে নন্দিনীকে নিয়ে ও অদৃশ্য হতে না হতেই, বিরাট এক হল্লা কানে এলো।

তর্জন গর্জন, তারপর আরো তর্জন আরো গর্জন—ঘোরতর আর ঘোরালো হয়ে ঘরের ভেতর থেকে যেন তেড়ে আসতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই তেড়ে বেরিয়ে এলো সিধু—তীরের মতই ছিট্‌কে।

সিধুর মাথার চুল খাড়া, দেহ ক্ষতবিক্ষত, কাপড় জামা টুকরো টুকরো। মুখের চেহারা আঁচড়ে কামড়ে এমন হয়েছে যে তাকে আর চেনাই যায় না।

সিধুর চোখের সেই সম্মোহনী চাউনি আর নেই। প্রীতির বদলে সেখানে এখন ভীতি বিরাজ করছে। বিহ্বল হয়ে 'বাপরে'—বলে চীৎকার ছেড়ে এক লাফে সে মোটরে উঠলো, উঠেই স্টার্ট দিলে। আর সে কী স্টার্ট! মোটরকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল সে!

বাপ্‌রে বলে মাইল দুয়েক গিয়ে সিধু বললে,—'বাপ্‌'! বলে সে হাঁপ ছাড়লো। তার দু'মাইলব্যাপী 'বাপ্‌রে বাপ্‌' আমি শুনলাম। বললাম—'কী হয়েছে? নন্দিনী কি রেগে মেগে তোমায় —তোমাকেই···?'

'নন্দিনী না ছাই!' চেঁচিয়ে ওঠে সিধুঃ 'নন্দিনী তো আমার ঘরেই ছিলো, তেমনি বাঁধাই ছিলো তো!'

'তবে? তবে এ বাঘটা আবার কে? কোনো ভূঙ্গিনী নাকি?'

'কে জানে! আস্ত একটা জানোয়ার! জংলী ভূত!' বললো শুধু সিধু।

কাল

লীলা মজুমদার

সেবার পুজোয় কোথাও যাওয়া হবে না, এই রকম ঠিক ছিল। মহালয়ার দিন সন্ধ্যাবেলায় বলা নেই কওয়া নেই পালুদের বাড়ীতে আমার ছোট মামা উদয় হলেন। ছোট মামা তখনো বর্ধমানের সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করেন; অদৃশ্য কর্মী বলে খাতায় অবিশ্যি নাম ছিল না, তবে মাইনে একটু বেড়েছিল, তাই মাঝে মাঝে সহৃদয় সহযোগী বলে পালুকে আমাকে এটা-ওটা খাওয়াতেন।

বিশেষতঃ যখন ঠেকায় পড়তেন।

বড় মাস্টারমশাই তিমি শিকারের লোমহর্ষণ এক গল্প বলছিলেন। ছোট মামা পালুর হাতে এক ঠোঙা গরম পেঁয়াজি গুঁজে দিয়ে, ধপ করে ওর খাটে বসে পড়ে নিজের মাথার চুল একমুঠো ছিঁড়ে ফেললেন। তাই দেখে বড় মাস্টার গল্প বন্ধ করে ওর দিকে ফিরে বললেন, 'সামন্তর কাছে চাকরি পাবার মাদুলী, কি শনি ঘুচোবার মাদুলী পাবে হয়তো। ছুটিতে নাকি?'

ছোট মামা কাষ্ঠ হাসলেন। বড় মাস্টার বললেন, 'আর যদি গোপন তদন্ত হয় তো আমার নতুন মোটর-সাইকেলে যাওয়া যায়। নতুন মানে খুবই পুরনো, নইলে চারজনকে ধরবে কেন?'

আমরা দু'জনে কান খাড়া করে উঠে বসলাম।

ছোট মামা বড় মাস্টারের জুতোর আগায় কপাল ঠেকিয়ে, আমাকে বললেন, 'আহা-হা! তাই বলে সবগুলো খেয়ে ফেলিস্ না। ব্যাপার যথেষ্ট ঘোরাল, সমাদ্দারের মাথায় জলপটি দেওয়া হচ্ছে, থেকে থেকে হেঁচকি উঠছে।'

পালু মাথা নেড়ে বলল, 'তা হলে বোধ হয় আর বেশিদিন নেই। সুবিধা পেলেই একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিলে পার, বিনু তালুকদার সেটুকু আশা করবে।'

এখানে বলে রাখা উচিত যে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে একনাগাড়ে দু' বছর কাজ করে সার্টিফিকেট পেলে তবে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বিনু তালুকদার ছোট মামাকে চান্স দেবে।

বড় মাস্টার বললেন, 'হেঁচকি কেন?' ছোট মামা একটু শিউরে উঠে বললেন, 'ভূত দেখেছেন—হেঁচকি উঠবে না? আমাকে তদন্তে যেতে হবে।' বড় মাস্টার ওঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আমাকে না, আমাদের। আমাদের চারজনকে যেতে হবে। গুপি, পালু, দু'দিনের খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করিস্। শুকনো জিনিস, লুচি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, মাংসের বড়া, কড়াপাকের সন্দেশ, জিবে গজা—আচ্ছা, ব্যাপারটা কি তা তো বললে না? চাঁদু যথেষ্ট কোকাকোলা নিস্ রে।'

একটু সুস্থ হয়ে, ছোট মামা যা বললেন তার সারমর্ম হল এই। অপিসে কাজকর্ম এ সময়ে কমই থাকে। এ বছর আরো খারাপ, তিনদিন কোন মক্কেল আসে নি। সেন আর চৌধুরী ছুটিতে। ঘাঁটি আগলাচ্ছেন সমাদ্দার সাহেব আর ছোট মামা। কেউ না থাকলে দ্বিতীয় টিকটিকির নিজেকে প্রকাশ করতে দোষ নেই, হঠাৎ যদি মক্কেল এসেও পড়ে, ওঁকে স্বচ্ছন্দে আরেকজন মক্কেল বলে চালানো যায়। তার চেয়ে আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়, যদি সন্দেহজনক আইনভঙ্গকারী বলা হয়। ঐ মিনমিনে ভালো মানুষের মতো চেহারার সঙ্গে ঐ চকচকে যে কোন সত্যিকার গুপ্ত গোয়েন্দারা থাকতে পারে, এমন কথা কেউ সহজে বিশ্বাস

করবে না।

সে যাই হোক, দু'দিন ধরে দোতলার জানালা দিয়ে দেখা গেল একটা ষণ্ডা কালো লোক, মাথায় অস্বাভাবিক ঝাঁকড়া চুল, পরচুলাও হতে পারে—চোখে কালো চশমা পরে বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে আর আড়চোখে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের জানালার দিকে তাকাচ্ছে, তারপর একদিন টিফিন খেয়ে ফেরার সময় সমাদ্দার তাকে হাতে-নাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। কাটা চাবির ফুটো দিয়ে ভেতরে দেখবার চেষ্টা করছিল।

ছোট মামা টেবিল থেকে ঠ্যাং নামিয়ে, ফুচকার ঠোঙা লুকিয়ে ফেললেন। লোকটা বলল, 'ইয়ে কিছু মনে করবেন না স্যার, সামনে আসবার ঠিক সাহস পাচ্ছিলাম না। পাড়াগাঁ থেকে আসছি কি না! নাম নেপেন হোড়, গ্রাম পদমপুর, জেলা বর্ধমান। একটু সঙ্গে না গেলে, গ্রামে ঘুঘু চরবে এখনি, দলে দলে লোক পালাতে শুরু করেছে।'

স্যার বললেন, 'কেন পালাচ্ছে?'

'ইয়ে, আমাদের দেড়শো বছরের বড় ইঁদারাটাতে আগুন লেগে গেছে কি না, সে কিছুতেই নেবানো যাচ্ছে না। পুকুর থেকে জল তুলে ঢেলে ঢেলে কাছা বেরিয়ে গেল স্যার, তবু আগুন সমানে জ্বলছে, লোকে বলছে অপদেবতা ভর করেছে। গাঁ উজোড় হয়ে গেল স্যার, এক রকম বলতে গেলে আমাদেরি গ্রাম, আমার পূর্বপুরুষরাই ওখানকার জমিদার ছিলেন কিনা, প্রাণ থাকতে'—এই অবধি বলে হাউমাউ করে কেঁদে লোকটা স্যারের পা জড়িয়ে ধরল।

স্যার বললেন, 'কিসে করে নিয়ে যাবেন?'

'কেন স্যার ঠাকুরদার বন্ধুর পুরনো মোটরের কারখানা থেকে একটা গাড়ি ধার করে আনব, স্যার। আমি চালাব।'

স্যার বললেন, 'যান, নিয়ে আসুন। আমি তৈরী হচ্ছি।'

লোকটা চলে গেলে ছোট মামা বললেন, 'সত্যি যাবেন, স্যার?' সমাদ্দার সাহেব হাসলেন, 'হাতের লক্ষ্মী কখনো পায়ে ঠেলো না হে।

ঐ ইঁদারার নিচে নিশ্চয় পেট্রলের খনি আছে। তাই থেকে তেল চুঁয়ে জলে মিশেছে। তাতে কেউ বিড়ি ফেলেছে, ব্যস্ অগ্নিকাণ্ড। যে নতুন তেলের খনির সন্ধান দিতে পারবে, সরকার তাকে যথেষ্ট টাকাকড়ি দিয়ে থাকেন। চট্‌পট্ প্রস্তুত হও, দু'জনে যাই, হাজার হোক অচেনা জায়গা। পকেটে একটা শিশি নিতে ভুলো না।'

তারপর ছোট মামা বাকি পেঁয়াজিগুলো সব খেয়ে ফেলে বললেন, 'রামকানাই আজকাল কিছু বানায়-টানায় না?' রামকানাই এক থালা আলুর বড়া নামিয়ে, রেখে বলল, 'বানাতেই হয়।'

ছোট মামা বলতে লাগলেন, 'যেমন লোক, তেমনি গাড়ি, রং-চটা, লড়ঝড়ে এখানে ওখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা।' বলল, 'ওখানেই জলযোগটা হবে, কি বলেন স্যার? স্থানীয় বাঁক-তুলসী চালের চিঁড়ে দিয়ে, কপি মটরশুঁটির পোলাও আর মাছের বড়া আর এক বোগনে-মোষের দুধের পায়েস—তার জন্যেই কত লোকে পদমপুরে গিয়ে পড়ে থাকত।' এই বলে এমনি জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল যে নিজের দাড়ি-গোঁফ উড়তে লাগল। বলেছিলাম কি, লোকটার এক মুখ দাড়ি-গোঁফ তা সে সত্যি হোক কি নকল হোক?

জলখাবার দেবে যখন তখন আর আমাদের কি আপত্তি থাকতে পারে? স্যার বললেন, 'সঙ্গেই যাচ্ছ যখন, ঘড়ি জামিন রাখতে হবে না। পরে বিল করব।'

গাড়িও তেমনি গুবরে পোকার মতো হামাগুড়ি দিয়ে চলল। এক সময়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে বাঁ হাতের সড়ক ধরল। স্যারের সঙ্গে নেপেন দেখলাম খুব জমিয়ে নিয়েছে। বলল, 'এ-সব খুব পুরনো পথ, স্যার, শের শা'র আমলের। কেমন সব আম-কাঁঠালের বাগান দেখেছেন, আড়াই শো বছরের তিন শো বছরের পুরনো। শের শা' এর ফল খেয়েছে। কেউ অত বড় পুকুর কাটে আজকাল? জল প্রায় নেই, কিন্তু নিরেট পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট লক্ষ্য করলেন? মাছ কিলবিল করছে। শের শা'র মাছের বংশধর। এইসব পথ দিয়েই নবাব প্রতি বছর একবার

হাতি চেপে দিল্লী যেতেন, বাদশাকে নজরানা দেবার জন্য। সঙ্গে থাকত সাত-আটশো লোক, পাইক, সেপাই, বরকন্দাজ, ফরাশ, হুঁকো বরদার, নিৎমদ্‌গার, রসুইকার, বাজনদার উজির-নাজির লোক-লস্কর। রাতে যখন তাঁবু পড়ত মনে হত নতুন একটা শহর পত্তন হল। ততক্ষণে আরেক দল অনুচর আরো কুড়ি মাইল এগিয়ে পরের রাতের তাঁবুর বন্দোবস্ত করতে লেগেছে। সব জায়গা-জমি ঠিক করা থাকত, প্রতি বছর একই জায়গায় তাঁবু ফেলা হত।'

এদিকে গাড়িটা খুব ভালো চলছিল না। ভেতর থেকে কেমন একটা ছক্‌ছক্‌ শব্দ হচ্ছিল। বেলাও পড়ে আসছিল, সূর্য ডুবতে খুব বেশি দেরি ছিল না, স্যার একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওহে, আর কত দূর? দিন যে শেষ হল।' নেপেন হেসে বলল, 'তাতে কি স্যার? হাতে কোনো কাজকম্ম নেই, সে খবর কি আর নিইনি—রাত কাটাবার নানা বন্দোবস্ত আছে। আর খুব বেশি দূরও নয়। এ জায়গাটার নাম বড় খারাপ বুঝলেন। দেখলেন না পথে একটা লোক নেই। সন্ধ্যের পর কেউ আসে না এদিকে। ঐ যাঃ, গাড়ি যে থেমেই গেল।'

শুনে আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা। নেপেন বনেট খুলে দেশলাই জ্বেলে কি ঠুকঠাক করতে লাগল। তারপর বনেট বন্ধ করে, চট্‌ করে একবার হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে, দেশলাই নিবিয়ে বলল, 'তাই তো, কি করা যায়?' বললাম, 'পেট্রল আছে তো?' নেপেন কোত্থেকে একটা লম্বা কাঠি বের করে পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিল।

'এই রে! যা বলেছেন ঠিক তাই! পেট্রল তো নেই! এখন কি করি?' কি করার জন্য আর অপেক্ষা করতে হল না, হঠাৎ আম বাগানের পেছনটা মশালের আলোয় আলো হয়ে গেল। রে-রে-রে করে একদল দস্যু আমাদের তিনজনকে পাছ-মোড়া করে বেঁধে নিয়ে চলল—'কি, হাসছিস যে বড়?'

পালু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না—মানে ইয়ে—তারপর কি হল?'

ছোট মামা বললেন, 'বোধহয় মুচ্ছো গেলাম। জ্ঞান হল শের শা'র

তাঁবুতে। 'এ্যাঁ! বল কি!' বড় মাস্টার সুদ্ধ লাফিয়ে উঠলেন। ছোট মামা বললেন, 'যেমন যেমন ঘটেছিল বলে যাচ্ছি। হাতির ডাক, ঘোড়ার খুরের শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনানি, নাচের বাজনা, সব কানে আসছিল। নেপেন ঠিকই বলেছিল, শের শাহের দিল্লী যাত্রা ছিল এক এলাহি ব্যাপার।'

চোখ চেয়ে দেখি, স্যার আর আমি বাঁধা অবস্থায় শের শা'র পায়ের কাছে গালচের ওপর শুয়ে আছি। আর শের শা' অনুচরদের ধমকাচ্ছে, 'এত রোগা দিয়ে কি করে চলবে? আর পেলে না নাকি। এখন কি করে কি হয় বল দিকি?' প্রধান অনুচর বলল, 'খাইয়ে দাইয়ে একটু চাঙ্গা করে নিলে হয় না?' শের শা' হতাশার সুরে বলল, 'তা ছাড়া তো উপায় দেখি না। দেখ চেষ্টা করে—তবে সময় খুব কম, জানই তো ভোরের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হতে হবে।'

এই অবধি শুনে বোধহয় আবার মুচ্ছো গেছিলাম। বাকিটা কেমন আবছা মনে পড়ে, টানা হ্যাঁচড়া, মারামারি, হাতি ঘোড়া, শেকল, কয়েদ। জ্ঞান হল গভীর রাতে, স্যার এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরে, অন্য হাতে আমাকে ঝাঁকাচ্ছেন। দেখি চারদিকের আলো নেবানো, যার যেখানে গালচের ওপর ঘুমোচ্ছে। স্যার নিঃশব্দে আমাকে টেনে তাঁবুর বাইরে আনলেন। তারপর টেনে দৌড়।

ছুটতে ছুটতে যখন আর দম পাচ্ছি না, তখন দেখি আবার গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডে এসে পড়েছি। সামনেই ট্রাক ড্রাইভারদের লঙ্গরখানায় মিটমিট আলো জ্বলছে। টলতে টলতে কোনোমতে সেখানে গিয়ে উঠলাম। স্যারের পকেটের মানিব্যাগ কেউ ছোঁয়নি—অশরীরীরা মানিব্যাগ নিয়ে করবেই বা কি—দু'জনে বড় বড় মগে করে গরম চা আর মোটা মোটা হাতরুটির সঙ্গে ডিমের অমলেট খেয়ে, বর্ধমানগামী একটা ট্রাকে করে ফিরে এলাম।'

একটু চুপ করে থেকে ছোট মামা বললেন, 'সেই ইস্তক স্যার খাটে শুয়ে হেঁচকি তুলছেন। আমাকে রহস্য উদঘাটন করতে হবে। সামন্তর

কাছে ভূতের মাদুলি আছে বললি না ?'

বড় মাস্টার বললেন, 'সারা জীবন এই রকম একটা কিছুর জন্যই অপেক্ষা করে আছি। আর সব তো করেছি, সমুদ্রের ওপরে বা তলায়, ডাঙ্গায় বা শূন্যে কি না দেখছি ! সব করেছি, বাদে অশরীরী অনুসন্ধান। ওঠ হে, তৈরি হও। কাল সকালেই যাওয়া। চাঁদু, জায়গাটা চিনিয়ে দিতে হবে।'

শুনে ছোট মামা বেশ ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। তবু স্যারকে তো আর হেঁচকি তুলে অক্কা পেতে দেওয়া যায় না। গেলাম চারজনে পরদিন সকালে। বাড়িতে বলা হল পিকনিকে যাচ্ছি। পরদিন ফিরব। যথেষ্ট খাবার-দাবার নেওয়া হল। দেড ডজন কোকাকোলা। বড় মাস্টার এক ঠোঙা চানাচুর আনলেন। ছোট মামা এক প্যাকেট লজেন্স।

ট্রাক ডাইভারদের কারখানা ছোট মামা চিনতে পারলেন। সেখান থেকে ডানদিকে সরু পথ বেরিয়ে গেছে। কারখানার লোকরা কুয়োতে আগুন ধরার কথা শোনেনি, তবে বড় বড় অতি প্রাচীন আম-কাঁঠালের বাগানের কথা জানে। 'কোন বাগান খুঁজছেন ?'

বড় মাস্টার বললেন, 'কোনো একটা ল্যাণ্ড মার্ক মনে করতে পার না, চাঁদু ?' হঠাৎ ছোট মামা খুসি হয়ে বললে, 'দুটো প্রকাণ্ড পুকুরের মাঝখানে ভাঙ্গা মন্দির।' তারা বলল, 'ও হো ! ঐ ডান হাতের পথ দিয়ে মাইল চারেক এগিয়ে যান, পেয়ে যাবেন।'

গোরু খোঁজা করলাম জায়গাটাকে। দুপুর হয়ে গেল, খাবার জন্য একটা ভালো জায়গাও পাওয়া গেল। দুটো পুকুরের মাঝখানে ভাঙ্গা মন্দির। ছোট মামা চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'এই তো, এই তো সেই জায়গা, এইখানে গাড়ি বন্ধ হয়েছিল, আর ঐ—ঐ যে সেই আমবাগান ! চল, চল।' ছোটমামার দিনের বেলায় বেজায় সাহস।

বড় মাস্টার বললেন, 'না খেয়ে কোথাও যাব না।'

দিব্যি লুচিটুচি খাওয়া গেল।

তারপর কোকাকোলা দিয়ে কুলকুচি করে, বড় মাস্টার পথের মাটি

পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। হয়তো বর্মার শিক্ষা, যদিও সে-সব সত্যি নয়, হঠাৎ ছোট মামা আবার চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি, ইউরেকা!' মাটিতে অনেকটা তেলের দাগ। বড় মাস্টার বললেন—

'ব্যাটা ইচ্ছা করে কোনো উপায়ে তেল বের করে দিয়েছিল। কোন্ দিক্ দিয়ে নিয়ে গেছিল?' ছোট মামা আমবাগানে ঢুকলেন। আমবাগান পেরিয়েই খোলা মাঠ। সেখানে সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে ট্রাকে বোঝাই করা হয়েছে। সারি সারি জন্তু-জানোয়ার, ভ্যান্ করা লোকজন। নাকি 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস।' পনেরো দিন খেলা দেখিয়ে বর্ধমান যাচ্ছে।

আমরা চারদিক ঘুরেফিরে বুঝলাম পদমপুর বলে কোনো গ্রাম-ই নেই ও-অঞ্চলে। বর্ধমানে ছোট মামার ছোট ফ্ল্যাটে রাতটা কাটালাম। বড় মাস্টারের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই সমাদ্দার সাহেবের হেঁচকি সেরে গেল। রাতে ক্যালকাটা ক্যান্টিনে গিয়ে পোলাও কালিয়া খাওয়া হল। পরদিন ফেরা। ছোট মামা চিনু তালুকদারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

আসলে তখনো ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝিনি। কালীপুজোর কয়েকদিন পরে ছোট মামা এসে বললেন, 'ফিল্ম দেখবি নাকি? চিনু তালুকদার পাস দিয়েছে। অ্যামেচার কোম্পানি প্রাইভেট শো, নাকি খুব ইন্টারেস্টিং। কি একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে, এক মাসের মধ্যে কত কম খরচে কত ভালো ছবি তোলা যায়। এরা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে!'

সে আর বলতে! বাবা-মা পর্যন্ত দেখতে গেলেন। খাসা ফিল্ম। তার নাম 'কাল', প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা, বিনি পয়সায় দিয়েছেন। মোঘল শিবিরে কি করে যেন সময় কালের গণ্ডগোল হওয়াতে, কেমন করে, ভুলক্রমে দু'জন আধুনিক গোয়েন্দা বন্দী হয়েছিল ও স্রেফ বুদ্ধিবলে শেষ অবধি পালিয়েছিল, এই কাহিনী। নাকি সামান্য খরচে সার্কাসের তাবুতে তোলা, তাদের খেলা আরম্ভ হবার আগের দিন। অভিনেতারা জেনে, কিম্বা না জেনে, মিনি-মাগনা অভিনয় করেছেন। মোট খরচ

সাতশো টাকা পঁচাত্তর পয়সা। ডায়ালগ অ্যামেচাররা পরে জুড়েছেন।

দেখলাম গাঁট্টা-গোট্টা ঝাঁকড়া চুল, ইয়া দাড়ি গোঁফ শের শা' মসনদে আছেন, ছাড়লণ্ঠন, সেজবাতি, তলোয়ার ঝোলানো লোক-লস্কর। এমন সময় কতকগুলো বিকট চেহারার পাষণ্ড প্যাটার্নের লোক সমাদ্দারকে আর ছোট মামাকে বেঁধেছেঁদে চ্যাংদোলা করে তাঁর সামনে এনে ফেলল। ছোটমামা মহা উত্তেজিত, 'তাই খট্‌কা লাগছিল! শের শা'র হাতে এইচ-এম-টির সোনার ঘড়ি কেন! ঐ ব্যাটাই নেপেন!' আমরা তো হাঁ!

দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন ছোট মামা। 'এবার সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ নেপেন হতভাগার কাজ। নিজে সেজেছে শের শা', এখন দুটো সস্তায় টিকটিকি চাই, তা ধরে আন দুটো জলজ্যান্ত বিনি পয়সার টিকটিকি! বাঃ, বেড়ে ব্যবস্থা তো! ধরি না একবার লক্ষ্মীছাড়াকে—'

হলও সে সুযোগ। সবার শেষে বিজয়ী চিত্রকে স্বর্ণ পদক ও নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হল। সে কি হাততালি! হঠাৎ দেখি ঝড়ের মতো মুখ করে ছোট মামা স্টেজের দিকে চলেছেন। দুই হাতে ঘুঁষি পাকানো। আমার তো চক্ষুস্থির! এক্ষুণি ছোট মামাকে ছিঁড়ে ফেলে দেবে! পালুকে ইসারা করে সবে এগুতে যাব, এমন সময় ছোট মামার ওপর নেপেনের চোখ পড়ল। অমনি পুরস্কার হাতে ছুটে এসে ছোট মামার সামনে হাঁটু গেড়ে ব্যাটা বসে পড়ল। আর ছোট মামা 'আহা, ছি, ওকি, ওকি!' বলে তাকে টেনে তুলে কোলাকুলি করলেন। নরমে গরমে টিকটিকি হয়।

খুব খাওয়াল নেপেন আমাদের চারজনকে। মন্দ না লোকটা।

———

একদম রূপকথা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাব্‌লুর ছোটমামার একটু ডান দিকে বেঁকে যাওয়ার দোষ আছে। তাঁর শরীরটা ডান দিকে বেঁকে যায় না, শরীর ঠিকই থাকে, কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হলেই ডান দিক ছাড়া অন্য কোনো দিকের কথা তাঁর মনেই পড়ে না। বেলগাছিয়া থেকে ট্যাক্সি করে হয়তো যাচ্ছেন কলেজ স্ট্রীটে, শ্যামবাজারে এসে ড্রাইভার যেই জিজ্ঞেস করল, 'আভি কিধার সাব?' ছোটমামা অমনি বললেন, 'ডাইনা!' ব্যাস, চলে গেলেন টালার দিকে। খানিক বাদে রাস্তার পাশে একটা বিরাট গম্বুজ দেখে তাঁর খেয়াল হল, এটা তো কলেজ স্ট্রীটের দিকের রাস্তা নয়। ড্রাইভারকে তিনি বললেন, 'ইধার কাঁহে লে আয়া? অ্যাঁ?' ড্রাইভারকে বকাবকি করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললেন তক্ষুনি। খানিক বাদেই ছোটমামা আবার অন্যমনস্ক। শ্যামবাজারে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভার ফের জিজ্ঞেস করল, 'বলিয়ে আভি কিধার?' ছোটমামা গম্ভীরভাবে বললেন, 'ডাইনা!' ব্যাস, কলেজ স্ট্রীটের বদলে ট্যাক্সি চলে গেল অন্যদিকে।

এ রকম যে কতবার হয়েছে তার ঠিক নেই!

কারুর ঠিকানা খুঁজে বার করতে হলেই ছোটমামার পক্ষে দারুণ বিপদ। উনি রাস্তার বাঁ দিকের বাড়িগুলো একদম দেখবেন না।

দুদিকে দুটো গলি থাকলে ঠিক ডান দিকে বেঁকবেন।

সবচেয়ে মজা হল ওঁর নিজের কলেজে।

বাব্লুর এই ছোটমামার নাম হারানচন্দ্র রক্ষিত। বেশ নামকরা লোক। অঙ্ক আর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তিনখানা বই লিখেছেন! সেই বই এখনো অনেকে পড়ে। সেই বইগুলো যে প্রকাশক ছাপিয়েছেন তাঁর বেশ সুবিধে। ছোটমামাকে পয়সা দিতে হয় না। দোকানটা কলেজ স্ট্রীটের বাঁ ফুটপাথে কিনা! ছোটমামা ডান দিকটা খুঁজে খুঁজে সেই দোকানের সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসেন।

ছোটমামা যে অঙ্কে এত ভাল, তার কারণ, সব অঙ্কই ডান দিক থেকে শুরু করতে হয়। যদি অঙ্ক জিনিসটা বাঁ দিক থেকে শুরু হত, তা হলে ছোটমামার বোধহয় লেখাপড়া শেখাই হত না।

ছোটমামা একটা কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক। ওঁর প্রথম ক্লাসটা থাকে তিনতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকের ঘরে। প্রায় প্রত্যেক দিনই ছোটমামা খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকের ঘরটায় ঢুকে পড়বেন সেখানে তখন সেকেণ্ড ইয়ারের ইংরিজির ক্লাস হবার কথা। ছেলেরা ছোটমামাকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে। 'হারান-স্যার আজ আবার ঘর হারিয়ে ফেলেছেন!'

অনেকদিন এ রকম হবার পর কলেজের প্রিন্সিপাল ঘর দুটো বদলে দিলেন। ছোটমামার প্রথম অঙ্কের ক্লাসটা ডান দিকের ঘরেই হবে। তাতেও তবু সুবিধে হল না। কারণ, ছোটমামার দ্বিতীয় ক্লাসটা দোতলায়। প্রথম ক্লাসটা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়েই ছোটমামা ডান দিকে হাঁটতে শুধু করেন। সিঁড়ি পড়ে রইল বাঁ দিকে। ডান দিকের লম্বা বারান্দাটার একেবারে শেষ কিনারায় গিয়ে ছোটমামা আপন মনে বলে ওঠেন, 'দূর ছাই, সিঁড়িটা গেল কোথায়?'

ছোটমামার এই ডান দিকে বাঁকার রোগ নাকি সেই একেবারে ছেলেবেলা থেকে। বাব্লুর দিদিমা বলেন, 'নিশ্চয়ই বাচ্চা বয়সে ওর দিকে কোনো ডাইনি নজর দিয়েছিল, তাই ডান দিকে ছাড়া আর কিছু

চেনে না।'

বাব্‌লুর মা তাই শুনে বলেছিলেন, 'তোমাকেও মা বলিহারি। তুমি কেন ছোড়দার নাম হারান রেখেছিলে? তাই তো ছোড়দা সব সময় হারিয়ে যায়!'

বাব্‌লু বলেছিল, 'ভাগ্যিস পদবীটা রক্ষিত! তাই ছোটমামা শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়ে যান।'

এই ছোটমামাকে কখনো কলকাতার বাইরে যেতে হলে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ-না-কেউ সঙ্গে যায়। নইলে ছোটমামা বারবার দিক ভুল করে সব কাজ পণ্ড করে ফেলবেন।

একবার ছোটমামাকে যেতে হল মুর্শিদাবাদে। ওখানে ছোটমামাদের খানিকটা জমি আছে। মুর্শিদাবাদে আর যাওয়া হয় না, জমিটাতে চাষবাসও করা হয় না, এমনি-এমনি পড়ে আছে বলে ছোটমামা ঠিক করেছেন, এ জমি গভর্নমেণ্টকে দান করে দেবেন। চিঠিপত্র লিখে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, শুধু মুর্শিদাবাদে গিয়ে সেট্‌লমেণ্ট অফিসে ছোট মামাকে সই করে আসতে হবে। সঙ্গে যাবার আর কেউ নেই। তাই ঠিক হল বাব্‌লু যাবে। বাব্‌লুর পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে, স্কুল ছুটি।

বাব্‌লুর বয়স চোদ্দ বছর, সে একা-একা রাস্তাঘাট চিনে যেতে পারে, সে ঠিক ছোটমামাকে সামলাতে পারবে।

প্রথমেই তো গোলমাল হয় শিয়ালদায় গিয়ে।

প্লাটফর্মের দু'পাশে দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে। ছোটমামা গেট দিয়ে ঢুকেই গট্‌মট্‌ করে উঠে পড়লেন ডান দিকের ট্রেনটায়। বাব্‌লু ছোট-মামার হাত ধরে টেনে নামিয়ে এনে বলল, 'এ কী করছ ছোটমামা? এটা তো যাবে দার্জিলিং! আমাদের মুর্শিদাবাদ লোকাল ঐ বাঁ দিকেরটা!'

ছোটমামার একটা গুণ এই যে, ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি তক্ষুনি তা মেনে নেন। একগাল হেসে বললেন, 'তাই তো, খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল তো! গরম কোট সোয়েটার আনিনি, এই অবস্থায় কি দার্জিলিং যাওয়া

যায়? তোর খুব কষ্ট হত!'

বাব্‌লু ছোটমামাকে নিয়ে উঠে বসল বাঁ দিকের ট্রেনটায়। বলাই বাহুল্য, ছোটমামা বসলেন ডান দিকের জানলার পাশে।

তিন-চারটে স্টেশন পেরুবার পর সেই কামরায় উঠলেন টিকিট চেকার। টিকিট ছোটমামার কাছে। ছোটমামা পরে আছেন ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর একটা পাত্‌লা জহর কোট। মুখে চুরুট। ছোটমামা চুরুটটা নামিয়ে রেখে বললেন,···দিচ্ছি!···

তারপর ছোটমামা জহর-কোটের পকেট, পাঞ্জাবির পকেট সব খুঁজলেন। তারপর বললেন, 'এই রে, টিকিট বোধহয় তাহলে ভুল করে বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছি!'

বাব্‌লু সব নজর রাখছিল। বাঁ দিকের জানলার কাছ থেকে উঠে এসে সে খপ্‌ করে ছোটমামার পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। অমনি পাওয়া গেল টিকিট।

ছোটমামা বললেন, 'তাই তো! ইশ্‌, মনেই পড়েনি!'

টিকিট চেকারটি কেমন যেন অবাকভাবে তাকালেন ছোটমামার দিকে।

একটু বাদে বাব্‌লুকে কাছে ডেকে ছোটমামা কানে-কানে ফিসফিস করে গোপন কথা বলার মতন ভঙ্গি করে বললেন, 'শোন বাব্‌লু, তোকে একটা কাজের কথা বলি। মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নেমে কিন্তু বাঁ দিকে গেলে সেট্‌লমেণ্ট অফিস। ভুল করে ডান দিকে চলে গেলে কিন্তু অনেক ঘুরপাক খেতে হবে!'

বাব্‌লু অবাক। ছোটমামার তা হলে মাঝে-মাঝে বাঁ দিকের কথাও মনে থাকে দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য এর পর দু'বার ছোটমামা বাথরুমে যেতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। বাথরুমটা কামরার বাঁ দিকে। দু'বারই বাব্‌লু আবার ছোট-মামার হাত ধরে বাথরুমের কাছে নিয়ে গেল।

মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নেমে একটা সাইকেল-রিক্‌শায় চেপেই ছোট-

মামা বললেন, 'ডাহিনা চলো।'

বাব্লু বলল, 'বাঃ, তুমি যে নিজেই বলেছিলে যে, সেট্লমেণ্ট অফিস বাঁ দিকে।'

ছোটমামা বললেন, 'তাই বলেছিলাম বুঝি? চল্ তা হলে। অবশ্য ডান দিক দিয়েও যাওয়া যায়। তোরা বুঝিস না, শুধু ডান দিকে ঘুরেও পৃথিবীর সব জায়গায় যাওয়া যায়। এটা হল সিম্পল ম্যাথ্মেটিকস্!'

যাই হোক, সেট্লমেণ্ট অফিসের কাজকর্ম খুব সহজেই মিটে গেল। ফেরার ট্রেন আবার রাত্তিরে। কিন্তু ছোটমামা আগেই ঠিক করেছেন, একদিন দু'দিন এখানে হোটেলে থেকে বাব্লুকে মুর্শিদাবাদের সব ভাল ভাল ঐতিহাসিক জায়গা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

সই-টই করে বেরিয়ে আসবার পর ছোটমামা বললেন, 'আগে একবার আমাদের জায়গাটা দেখে এলে হয় না? দিয়েই তো দিলাম, একবার শেষ দেখা দেখে নিই! ছোটবেলা ওখানে অনেকবার এসেছি। অনেকখানি জমির সঙ্গে একটা ছোট বাড়ি আছে, পুকুর আছে, পেয়ারা গাছ আছে…।'

বাব্লু বলল, 'হ্যাঁ চলো, সেই জায়গাটা দেখে আসি। পেয়ারা গাছে পেয়ারা হয়?'

ছোটমামা বললেন, 'হ্যাঁ, হবে না কেন! আমি ছোটবেলা গাছে চড়ে কত পেয়ারা পেড়েছি। ডান দিকের একটা ডালে এই অ্যাত বড় বড় পেয়ারা!'

একটা সাইকেল-রিকশায় উঠে ছোটমামা ডান দিকে না-বলে বললেন, 'চলো কাটারা মসজিদের দিকে। ওখানে গেলেই আমি ঠিক চিনতে পারব।'

কাটারা মসজিদের কাছে এসে রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, 'বাবু এবার কোন্ দিকে?'

ছোটমামা বললেন, 'ঐ তো ডান দিকে একেবারে সোজা রাস্তা।'

ডান দিকে খানিকটা যাবার পর রাস্তাটা এক জায়গায় বাঁ দিকে

বেঁকে গেছে। সেখানে পৌঁছেই ছোটমামা বললেন, 'ও দিকে নয়, ও দিকে নয়, আবার ডান দিকে।'

বাব্‌লু বলল, 'ছোটমামা, ডান দিকে তো রাস্তা নেই, শুধু মাঠ। বাঁ দিকেই যেতে হবে নিশ্চয়ই!'

ছোটমামা বললেন, 'তুই থাম্‌ তো! আমি স্পষ্ট চিনতে পারছি। তুই খালি বাঁ দিকে যেতে চাস্‌। আমার ডান দিকে ঘোরা রোগের মতন তোরও কি বাঁ দিকে ঘোরা রোগ হয়ে গেল নাকি? যখন সত্যিই ডান দিকে যাওয়া দরকার, তখনও বাঁ দিকে যেতে হবে?'

বাব্‌লু থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে সাইকেল-রিকশাটা লাফাতে লাফাতে চলল। আরও খানিকটা যাবার পর রিকশাওয়ালা বলল, 'বাবু আর কোথায়? এদিকে যে ধু-ধু মাঠ!'

ছোটমামা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আরে, তুমি চলোই না! যে তালগাছটা দেখছ, ওর ডান দিকে গেলেই...'

তালগাছের কাছে এসেও বাড়ি-ঘর কিছুই দেখা গেল না। তখন রিকশাওয়ালা জানাল যে, সে আর যেতে পারবে না।

ছোটমামা নেমে পড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এর পর আমরা হেঁটেই যাব।'

বাব্‌লু বলল, 'ছোটমামা, এরপর আমরা ফিরব কী করে? রাস্তাই তো চিনতে পারব না।'

ছোটমামা বললেন, 'তুই আয় না! মুর্শিদাবাদের সব আমার চেনা।'

রিকশাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ছোটমামা হন্‌ হন্‌ করে হাঁটতে লাগলেন। ডান দিকে দূরে কতকগুলো গাছপালা দেখা যাচ্ছে, ছোট-মামার মুখ সেই দিকে। বাব্‌লুও বাধ্য হয়েই পেছন পেছন চলল।

মিনিট দশেক হাঁটার পর সেই গাছগুলোর মধ্যে একটা বাড়ি দেখা গেল।

ছোটমামা বলল, 'ঐ যে ভাখ! দেখলি, আমি বলেছিলাম না যে,

ঠিক চিনতে পেরেছি জায়গাটা। ঐ তো আমাদের বাড়ি।'

কাছে গিয়ে বোঝা গেল, একসময় বেশ শৌখিন বাড়ি ছিল, সামনে পুকুর আর বাগান। এখন অনেক কিছুই ভেঙেচুরে গেছে, আগাছা গজিয়েছে চারদিকে। দেখলেই বোঝা যায়, এ-বাড়িতে অনেকদিন কোনো মানুষ থাকে না।

ছোটমামা ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে বাগানে ঢুকে বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, 'হুঁ-উ-উ, এই তো সেই বাড়িটা। অবশ্য তখন একতলা ছিল, এখন দোতলা হয়ে গেছে। তা তো হবেই, অনেকদিন অযত্নে পড়ে ছিল কিনা!'

বাব্‌লু ফিক করে হেসে ফেলল। অযত্নে পড়ে থাকলে বুঝি একতলা বাড়ি দোতলা হয়ে যায়?

ছোটমামা বললেন, 'পুকুরটাও গোল ছিল, এখন চৌকো হয়ে গেছে ···দেখাশুনা করার কেউ নেই তো!'

বাব্‌লু জিজ্ঞেস করল, 'পেয়ারা গাছ কোথায়?'

'কেন, পুকুরের ডান দিকে, দু'তিনটে পেয়ারা গাছ আছে।'

বাব্‌লু সেদিকে দৌড়ে চলে গেল। তারপর অনেক খুঁজল। সেখানে অনেক ঝোপঝাড়, দু'একটা আম আর জামগাছ থাকলেও পেয়ারা গাছ একটাও নেই।

বাব্‌লু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ছোটমামা, কোন্ ডান দিকে?'

'তার মানে?'

'এখান থেকে আমার ডান দিকে, না ওখান থেকে তোমার ডান দিকে?'

'এবার তোর ডান দিকটায় খুঁজে ছাখ।'

সমস্ত বাগান তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও বাব্‌লু কোনো পেয়ারা গাছ দেখতে পেল না।

ছোটমামার কাছে ফিরে এসে বাব্‌লু বলল, 'দেখা তো হল, এবার ফিরে চলো!'

ছোটমামা বললেন, 'দেখলি, বলেছিলাম কি না, কী সুন্দর বাড়ি আর বাগান। যাক্, শেষ দেখাটা হয়ে গেল। ছোটবেলায় এখানে কত খেলা করেছি! আর একটা জিনিস দেখা বাকি আছে।'

'কী?'

'যে-ঘরটায় আমি শুতাম, সেই ঘরটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান দিকের ঘর, রং-পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে আমার নাম লেখা। চল্, তোকে দেখাচ্ছি।'

বাব্লু আবার হেসে ফেলল, ছোটমামা যে সম্পূর্ণ কোনো ভুল বাড়িতে এসেছেন, তাতে তার কোনো সন্দেহই নেই।

বাড়িটার সামনের দিকে কয়েক থাক চওড়া সিঁড়ি, তারপর মস্ত বড় রক, তার ওপাশে একটা লম্বা হল-ঘর। দরজা-জানলা সবই ভাঙা।

ছোটমামা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে বললেন, 'হুঁ-উ-উ, এই বারান্দাটা আগে ছিল না বটে, সে যাই হোক, ভেতরের ডান দিকের ঘরটা···নিশ্চয়ই দেখবি দেখালে আমার নাম লেখা আছে এখনও।'

হল ঘরটা পেরিয়ে ভেতরে গিয়ে ছোটমামা ডান দিকের ঘরের দেয়ালে মনোযোগ দিয়ে নিজের নাম খুঁজছেন, এমন সময় বাবলু একটা আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠল। মানুষের গলার আওয়াজ। খুঁ-খুঁ-খুঁ শব্দে কে যেন কাঁদছে।

বাব্লু শিউরে উঠল একেবারে। প্রথম থেকেই তার সন্দেহ হয়েছিল, এ বাড়িতে ভূত আছে।

সে ছোটমামার জামা চেপে ধরে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

'কী বল্ তো ওটা?'

'আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে?'

'হাওয়া-টাওয়া হবে বোধহয়। চল তো দেখা যাক।'

সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আওয়াজটা আরও জোরে শোনা গেল। এবার বোঝা গেল আওয়াজ হচ্ছে ভেতর দিকের বাঁ দিকের একটা ঘর থেকে। একমাত্র সেই ঘরটারই দরজা অক্ষত আছে, সেই দরজার বাইরে

তালা বন্ধ।

ছোটমামা বললেন, 'ব্যাপারটা ভাল করে দেখতে হয়। চল্ তো।'

সেই ঘরের দরজায় কান পেতে ওরা শুনতে পেল একটা বাচ্চা-ছেলের মতন গলা। অনেকটা যেন দমবন্ধ-মতন অবস্থায় কাঁদছে।

দরজা ঠেলে একটু ফাঁক করে ভেতরে তাকিয়ে আরও চমকে উঠল বাব্লু।

ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে, তার হাত-পা মুখ বাঁধা। তার সামনে একটা ভাতের থালা, জলের গেলাস। ছেলেটা ওদের দিকেই ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে।

বাব্লু বলল, 'ছোটমামা, কী ব্যাপার?'

'তাই তো। ছেলেটাকে কে এখানে বেঁধে রেখে গেছে?'

'তালাটা ভাঙা যায় না?'

'দরজাটাও পুরনো। আয় দু'জনে মিলে ঠেলি।'

দু'জনে মিলে একসঙ্গে খুব জোরে ধাক্কা দিতেই দরজাটার একটা পাল্লা খুলে গেল। বাবলু সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে ছেলেটার মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? তোমাকে এখানে এই অবস্থায়…?'

ছেলেটা বলল, 'পরে বলব…পরে সব বলব। আমাকে ওরা মেরে ফেলবে। আপনাদেরও দেখতে পেলে মেরে ফেলবে। শিগগির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন।'

ছোটমামা চট্পট্ ছেলেটার হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা মানে কারা?'

ছেলেটা বলল, 'ডাকাত! আমাদের বাড়ি থেকে আমাকে চুরি করে এনেছে। আমাদের বাড়ি চন্দননগর। তিন দিন আমাকে এখানে… শিগগির চলুন, এক্ষুনি ওদের কেউ এসে পড়বে।'

ছেলেটা নিজেই তীরের মতন দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ছোটমামা আর বাব্লুও ছুটতে লাগল ওর সঙ্গে সঙ্গে।

মাঠের মধ্যে অনেকটা ছোটার পর পিছনে ধপ্ করে একটা শব্দ হতেই বাবলু মুখ ফিরিয়ে দেখল সেই বাড়িটার পাশ থেকে দুটো ষণ্ডামার্কা লোক ওদের দিকে তেড়ে আসছে আর ইঁট ছুঁড়ছে।

বাব্লু বলল, 'আরও জোরে ছোটো, ছোটমামা, ওরা আসছে।'

ছেলেটা বলল, 'ওদের কাছে বন্দুক আছে।'

ছোটমামা বললেন, 'এঁকে-বেঁকে ছোট, এঁকে-বেঁকে, তা হলে ওরা টিপ করতে পারবে না।'

সেই তালগাছটার কাছে এসে ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কোন্ দিকে রে বাবলু? ডান দিকে তো?'

বাবলু বলল, 'না, এবার বাঁ দিকে গেলেই বড় রাস্তা।'

'ঠিক বলেছিস।'

ওরা বড় রাস্তায় পৌঁছে আবার পেছন দিকে তাকাল। তখন আর ডাকাতদের দেখতে পাওয়া গেল না।

ফণিমুকুট রাজা

মনোজ বসু

আদিবাসী মুণ্ডাদের পল্লী, রাঁচির অনতিদূরে, ফণিমুকুট রাজারা তথায় রাজত্ব করতেন। মুকুটে পেঁচানো সাপের মূর্তি—প্রকাণ্ড ফণা, ফণার চূড়ায় মানুষের মুখ, এই থেকে ফণিমুকুট নাম। রাজবংশ এখন লোপ পেয়ে গেছে শুনতে পাই।

নাগরাজের ছেলে পুণ্ডরীক। রাজার ইচ্ছে, ছেলেকে শাস্ত্র পড়িয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু সাপ দেখলেই লোকে পালায়, সাপকে কে শাস্ত্র পড়াতে যাবে? ভেবে চিন্তে রাজা ছেলেকে বললেন, মানুষের মূর্তি নিয়ে নে তুই। কাশী চলে যা, শাস্ত্র পাঠ শেষ করে ঘরে ফিরে আসবি।

তাই হ'ল। পুণ্ডরীক আর সাপ নন, সুঠাম সুন্দর এক রাজপুত্র।

খুব নাম-করা এক পণ্ডিত ছিলেন কাশীতে, দেশ-বিদেশের অনেক ছেলে তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়ত। পুণ্ডরীক চলে গেলেন তাঁর কাছে।

মেধাবী ছেলে পুণ্ডরীক—যেমন চেহারা, তেমনি স্বভাব-চরিত্র। পণ্ডিত তাঁকে চোখে চোখে রাখেন, পণ্ডিতই শুধু নন—তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়ে মনিমালা। পুণ্ডরীক একেবারে বাড়ীর ছেলে হয়ে উঠেছেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। পড়াশুনা শেষ। পুণ্ডরীক দেশে-

ঘরে যাবেন এবার। নাগরাজাও ছেলেকে তাই বলে দিয়েছিলেন। পণ্ডিতের বাড়ীশুদ্ধ সবাই মন-মরা। পুণ্ডরীক চলে গেলে ঘরবাড়ী বুঝি অন্ধকার হয়ে যাবে।

পণ্ডিত পুণ্ডরীককে কাছে ডাকলেন, শোন, আমার যতকিছু বিদ্যা তোমায় দান করেছি। কিন্তু গুরুদক্ষিণা পেলাম কই?

পুণ্ডরীক বললে, আদেশ করুন।

পণ্ডিত বললেন, বুড়ো হয়ে গেছি—কোনদিন চোখ বুজব। অনেক যত্নে চতুষ্পাঠী গড়ে তুলেছি, চতুষ্পাঠী উঠে যাবে আমার মৃত্যুর সঙ্গে। তুমি এই চতুষ্পাঠীর ভার নাও, অধ্যাপনা করো। এই আমার গুরু-দক্ষিণা। নিশ্চিন্তে তা হলে মরতে পারব।

আর পণ্ডিতের স্ত্রী বললেন, মেয়েটার ভারও তুমি নাও বাবা। মনি-মালাকে বিয়ে করো।

রূপে-গুণে মনিমালা অতুলন। পুণ্ডরীকেরও মনে মনে সেই ইচ্ছে! তবে আর কি, বাধা কিসের?

বিয়ে হয়ে গেল। বাড়ী ফেরা মুলতুবি। শিষ্য ছিল পুণ্ডরীক, জামাই হ'ল এখন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক।

সাপ হয়েও পুণ্ডরীক পুরোপুরি মানুষ এখন। সাপের কয়েকটি লক্ষণ রয়ে গেছে শুধু।

মনিমালা রাত্রিবেলা পুণ্ডরীকের সঙ্গে এক বিছানায় আছে। পুণ্ডরীকের গায়ে হাত পড়তে সে শিউরে উঠলে: একি, এত ঠাণ্ডা কেন তোমার গা? অসুখ-বিসুখ কিছু আছে?

পুণ্ডরীক উড়িয়ে দেয় একেবারে, দূর, ঠাণ্ডা কোথায় দেখলে? হাতই ঠাণ্ডা তোমার।

কথা বলছে, মুখ থেকে ভক ভক করে দুর্গন্ধ বেরোয়; চমক খেয়ে মনিমালা বলে, বিশ্রী একটা গন্ধ তোমার মুখে—

হতে পারে—

বেকায়দায় পড়ে খানিকটা পুণ্ডরীক স্বীকার করে নেয়। বলে,

সকাল-সন্ধ্যে দু-বার করে আমার মুখ ধোওয়ার অভ্যেস। নানান ঝঞ্ঝাটে সন্ধ্যেবেলায় মুখ ধোওয়া আজ আর হয়ে ওঠে নি।

কৈফিয়ৎ মনিমালার মনে ধরে না। কিন্তু মুখে কিছু সে বলল না; উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল।

সকালবেলা বাপকে গিয়ে বলে, তোমার জামাইয়ের কি একটা সাংঘাতিক অসুখ। পেটের ভেতরের নাড়িভুঁড়ি পচে গিয়েছে মনে হয়। একবার কাছে এনে কথা বলিয়ে দেখো, টের পাবে।

জিনিসটা নিয়ে পণ্ডিত আর উচ্চবাচ্য করলেন না। দেখে শুনে পছন্দ করে জামাই করেছেন। জামাইয়ের মুখে উৎকট গন্ধ, চাউর হয়ে না যায়। লোকে বোকা বলবে আমাদের। শত্রু হাসবে।

সেই সময়টা ভাগ্যক্রমে প্রতাপগড়ের রাজবৈদ্য কাশীতে এসেছেন বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দেবার জন্য। অত বড় বৈদ্য ভূ-ভারতে আর নেই। পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে বহুকালের চেনা-জানা। রাজবৈদ্য বড় খাতির করেন তাঁকে। পণ্ডিত রাজবৈদ্যের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললেন, আপনি নিজে একবার দেখে যান বৈদ্যমশায়। দেখে-শুনে ওষুধ-পত্তোর দিন। ব্যাপারটা গোপন থাকবে। আপনি জানলেন আর আমি জানলাম। রোগীও অবশ্য জানবে। না জেনে উপায় কি?

বৈদ্য এসেই আচমকা পুণ্ডরীককে বললেন, হাঁ করো দিকি।

অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁ করতে হ'ল। বৈদ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্তকাল। মুখের কাছে মুখ এনে শুঁকলেন। ঘরের মানুষজন সরিয়ে দিলেন: রোগীকে কয়েকটা গোপন জিজ্ঞাসা আছে। আপনারা থাকলে হবে না।

তারপর নির্জন হলে কঠোর কণ্ঠে বৈদ্য শুধালেন: তুমি কে?

কে আবার, শাস্ত্র শিখতে এসেছিলাম। পাঠ অন্তে এখন অধ্যাপনায় আছি।

মানুষ তুমি কখনো নও। আমার কাছে ধাপ্পা দিতে এসো না। সাপ তুমি—নররূপ নিয়ে আছ। সাপের সর্বলক্ষণ তোমার দেহে। চেরা

জিভ—একেবারে ছুইখণ্ড। সাপ ছাড়া এ জিনিস হতে পারে না।

চাপা ভর্ৎসনা করে উঠলেন: সরল-বিশ্বাসী নিরীহ পণ্ডিত মশায়কে তুমি বঞ্চনা করেছ।

বৈছের পায়ে পুণ্ডরীক আছাড় খেয়ে পড়ল: আমি চলে যাচ্ছি। কাউকে বলবেন না এসব। চলে যাওয়ার পর তখন বলতে পারেন। শিক্ষা সারা হলেই ঘরে ফিরে যাবার কথা। যাওয়া হয় নি বলে বাবা রেগে যাচ্ছেন, কাল সকালেই আমি চলে যাব।

অধ্যাপক চলে যাচ্ছেন, ছাত্রেরা কত এসে বলল। পণ্ডিত মশায় নিজেও বললেন। পুণ্ডরীক অবিচল। যাবেই সে।

মনিমালা জেদ ধরল: আমিও শ্বশুরবাড়ী যাব তবে। যেখানে স্বামী সেইখানে আমি। স্বামীহারা হয়ে থাকতে পারব না।

বাপ-মাকে প্রণাম করে মনিমালা স্বামীর পিছু পিছু চলল। রাস্তা-ঘাট ছিল না তখনকার দিনে, গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থা নেই। পায়ে হেঁটে চলেছে দিনের পর দিন। মেয়েলোক হলে কি হয়, মনিমালাও সমানে যাচ্ছে পুণ্ডরীকের পিছন ধরে। মনে কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ: রাজবৈছের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর উপর টান ধরল কেন? রাজবৈছও আকারে ইঙ্গিতে কিছু বলে থাকতে পারেন।

বারংবার মনিমালা প্রশ্ন করে: তুমি কে? তুমি কে?

আর পুণ্ডরীকেরও তুড়ুক জবাব: মানুষ আমি আবার কে?

এমনি করে রাঁচি অঞ্চলে এসে পড়ল। অনেক—অনেক আগের কথা, এখনকার এই শহর ছিল না তখন। পাহাড়, জঙ্গল, বর্ষাকাল, জল জমেছে খানাখন্দে, বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে—আকাশে মেঘ থম থম করছে, বৃষ্টি আবার হবে।

একটা গুহা খুঁজে-পেতে নিয়ে সেইখানে ছুটিতে শুয়ে পড়ল, নাগরাজার রাজ্য আর সামান্য দূর। দেশে-ঘরে প্রায় তো এসে গেল—সেই আনন্দে পুণ্ডরীকের ঘুম হচ্ছে না। গ্যাঙর গ্যাঙ গ্যাঙর গ্যাঙ—ব্যাঙ ডাকছে এদিকে সেদিকে। লোভ সামলানো পুণ্ডরীকের দায় হয়ে

উঠল। পথশ্রমে ক্লান্ত মনিমালা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে—এই সুযোগ, এই সুযোগ! চুপিচুপি উঠে গুহা থেকে বেরিয়ে ডোবার ধারে চলে এসেছে। বড় বড় কোলাব্যাঙ বর্ষার জলে থলথল করছে। আর গলা ফুলিয়ে ডাকছে।

যাত্রা-থিয়েটারের পালার শেষে রাজা-মন্ত্রীরা সাজঘরে এসে গোঁফ-দাড়ি সাজপোষাক যেমন খুলে ফেলে দেয়, পুণ্ডরীকও তেমনি হাত-পা-মাথা একে একে দেহ থেকে খুলে ডোবার ধারে রাখল! লহমার মধ্যে সাপ হয়ে বুকে হেঁটে সরসর করে বেড়াচ্ছে। মনের আনন্দে ছোবল মারছে জলের উপর, ব্যাঙ ধরে ধরে খাচ্ছে।

পাতার খসখসানি হঠাৎ। ফণা ঘুরিয়ে সাপ চেয়ে দেখল—কী সর্বনাশ, মনিমালা যে এসে গেছে। ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে মনিমালা দেখল, পুণ্ডরীক পাশে নেই। তাকে খুঁজতে গুহা থেকে বেরিয়েছে। মানুষটা দেখতে দেখতে সাপ হয়ে গেল—স্বচক্ষে দেখেছে সে, ঠকঠক করে কাঁপছিল। তারপর সামলে নিয়ে মনিমালা ছুটে পালাচ্ছে। 'মনিমালা' 'মনিমালা' মানুষের মত নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সাপও ছুটল—বলে, কোথায় চললে তুমি? শোন, শোন—

মনিমালা বলল, কাশী ফিরে যাচ্ছি। মা-বাবার কাছে। শ্বশুরবাড়ী আমি যাব না।

সাপ বলে, স্বামী ছেড়ে চলে যাবে—সে হতে পারবে না। হতে আমি দেবো না।

প্রতারক, ভণ্ড—বলে গালিগালাজ করতে করতে মনিমালা আরও জোরে ছুটল।

পুণ্ডরীকও রেগেছে। এক-ফণা সাপ এই মুহূর্তে সহস্র ফণা হয়ে গেল। লেজের দিকে তরতর করে বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে আর কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। মনিমালার মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল। আর সেই হাজার ফণার ফোঁসফোঁসানিতে ঝড় উঠেছে।

মনিমালা ডাইনে-বাঁয়ে সামনে পিছনে যেদিকে পালাতে যায়, দেহ

যথেচ্ছ লম্বা হয়ে ফণাগুলো সেইদিকে ঝুঁকে পথ আটক করে। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মনিমালা পাগলের মতো ছুটোছুটি করল খানিক, জ্ঞান হারিয়ে তারপর মাটিতে পড়ল। ছেলে হ'ল সেই অবস্থায়। ছেলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের মৃত্যু, ছেলেকে মনিমালা বুকে নিতে পারল না।

সকাল হ'ল; মুণ্ডাদের পুরুষ-মেয়ের একটা দল বনের মধ্যে গাছ কাটতে এসেছে। ওঁয়া ওঁয়া করে কান্না শুনতে পায়। গিয়ে দেখে, পাথরের উপর ফুটফুটে এক বাচ্চা, প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ ফণা মেলে ছাতা ধরার মতন রোদ আচ্ছাদন করে আছে। সাপ দেখে লোক এগোয় না, ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করছে।

সাপ হঠাৎ মানুষের গলায় কথা বলে উঠলে: নাগ রাজপুত্র পুণ্ডরীক আমি। এই আমার ছেলে। তোমরা নিয়ে লালন-পালন করো, বড় হয়ে এই ছেলে খুব প্রতাপশালী হবে, রাজা হয়ে প্রজাদের শাসন-পালন করবে।

এই কথা বলে সাপ ছোট হতে হতে একেবারে কেঁচোর মতন হয়ে গেল। ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হ'ল দেখা গেল না।

পুণ্ডরীকের কথা ফলে গেল। মুণ্ডাদের মধ্যে বড় হ'ল সেই ছেলে। বিশাল এক অঞ্চলের অধিপতি হ'ল। সে রাজার মাথার মুকুটখানাতে ঠিক যেন এক অজগর সাপ হেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আছে। ফণা তুলে রয়েছে সে সাপ, ফণার চূড়ায় মানুষের মাথা।

ঐ রাজাদের তাই ফণিমুকুট রাজা বলত।

ডাকু

শৈলেন ঘোষ

আমি এক ডাকাত-দলের খুদে ডাকাত। আমরা দলে আছি সাত জন। দলের সর্দারকে আমার খুব ভাল লাগে। কেননা, সর্দার এক দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। এই বয়সে আমারও দারুণ সাহস। অবশ্য আমার সাহস আমার সর্দারেরই জন্যে। কারণ, সর্দার আমাকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছে। শুনলে অবাক হবে, আমি এখন জানি, একটা মস্ত বাড়ির মস্ত পাঁচিল কেমন করে ডিঙোতে হয়। আমি জানি, শত্তুরের মুখোমুখি পড়লে কেমন করে তাকে ঘায়েল করতে হয়। বাড়ির অন্দরে ঢুকে, ঘাপটি মেরে কেমন করে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়। গোয়েন্দাগিরি মানে তো সে এক সাংঘাতিক সাহসের কাজ। কারণ, সবার অজান্তে, সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খবরাখবর যোগাড় করতে হবে। তোমায় ঠিক-ঠিক বলতে হবে কোন্ বাড়ির, কোন ঘরের কোথায় সোনার গয়না আছে, কিংবা টাকার বাণ্ডিল কোন বিছানার নীচে লুকনো আছে। এই খবরের ঠিকানাটা যদি একটু বেঠিক হয়ে যায়, তাহলে যে কী ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, সে তো বুঝতেই পারছ!

বেঠিক আমার কোনোদিনই হয়নি। কারণ, যখন আমি গোয়েন্দা তখন আমায় কে বলবে ডাকাত! তখন আমি ছেঁড়া ঝুল-ঝুলি কাপড় পরে অন্ধ সাজব, নয়ত খোঁড়া। মিথ্যে মিথ্যে অন্ধের মতো ঠোক্কর খেতে খেতে আমি হাঁটব, নয়তো খোঁড়াব।

আমি দেখেছি, অন্ধ দেখলেই যেন মানুষের দয়া-মায়া সবচেয়ে বেশি উথলে ওঠে। অবিশ্যি সব মানুষের কি আর! যারা ফন্দি-ফিকির

খাটিয়ে মানুষ ঠকায়, তারাই যেন বেশি দয়ালু। আর একদিন এমনি এক ফন্দিবাজ লোক আমাকে সত্যি-সত্যি অন্ধ ভেবে, আমার হাত ধরে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আমাকে খুব যত্ন-আত্তি করে খাওয়াল। আর বিদায় দেবার সময় আমার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিল। আমি তো সারাক্ষণ অন্ধ সেজে বসে ছিলুম। আর সুযোগ পেলেই চোখ পিটপিট করে কোথায় কী আছে দেখে নিচ্ছিলুম। আলমারি খুলে যখন টাকাটি আমায় বার করে দিল, আমি স্পষ্ট দেখলুম, টাকা আর সোনাদানায় আলমারি একেবারে ঠাসা। আর কী। আমার কাজ সারা!

আমার এই সাহস আর বুদ্ধির জন্যেই সর্দারও আমায় তেমনি ভালবাসত। বলত, বড় হলে আমি একজন পাকা ডাকু হয়ে উঠব।

আমাদের লুটের মালগুলো সাতজনের মধ্যে ভাগাভাগি হলে সর্দারই পেত বেশি। আর আমার ভাগে কম। কারণ, আমি তো ছোট। তাছাড়া ওদের ঘর-সংসার আছে। বাড়িতে ছেলে-বৌ আছে। টাকা-পয়সা নিয়ে মাঝে-মাঝে ওরা বাড়ি যায়। ওদের দেখে আসে। আর আমার টাকা-পয়সা ওই সর্দারের কাছেই থাকে। আমি নিয়ে কী করব? আমার তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি যখন আরও ছোট ছিলুম, তখন ঘর-বাড়ির কথা আমার মনেই হত না। জানতুম, এই আমার ঘর, সর্দারই আমার সব। কিন্তু এখন কাউকে বাড়ি যেতে দেখলে আমার কেমন মন-কেমন করে। আমারও ইচ্ছে হয় বাড়ি যেতে। এক-একদিন রাতটা যখন নিঃঝুম হয়ে যায়, তখন যেন রাতের অন্ধকারটা মুখখানা ভীষণ ভেংচিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে, 'তোর মা কই রে?'

আমি চমকে উঠি, আর মনে-মনে ভাবি, তাই তো, আমার মা কই?'

আমাদের দলের সবচেয়ে পুরনো যে লোকটা, তাকেও আমার খুব ভাল লাগে। ফস্ করে একদিন তাকেই আমি জিজ্ঞেস করে বসি, 'আচ্ছা, তোমরা তো সময় হলেই বাড়ি যাও। আমার বাড়ি কোথায়?'

আমি যে আচমকা লোকটাকে এতদিন পরে এমন একটা প্রশ্ন করে বসব, সে বুঝবে কেমন করে! তাই যেন থতমত খেয়ে গেল। আমার

মুখের দিকে যখন চাইল, দেখলুম, তার চোখ ছুটো সন্দেহে চমকে-চমকে ছটফট করছে। সে কোনো কথা বলল না বলে আমি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'বলো না, তোমাদের মতো আমিও বাড়ি যাই না কেন ?'

এবার সে উত্তর দিল। বলল, 'তোমার তো বাড়ি নেই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'সবার আছে, আমার নেই কেন ?'

সে বললে, 'তা আমি জানি না।'

'তবে কে জানে ?'

'হয়তো সর্দার জানে।'

আমার আর তর সইল না। আমি তক্ষুনি সর্দারের কাছে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'সর্দার, আমার বাড়ি নেই কেন ?'

আচমকা বাজ পড়লে মানুষ যেমন চমকে যায়, সর্দার যেন তেমনি করে চমকে উঠল। তারপর নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'এই তো তোর বাড়ি।'

'এইটা ? তবে এখানে আমার মা-বাবা নেই কেন ?'

সর্দার যেমন হঠাৎ হাসতে শুরু করে ছিল, ঠিক তেমনি হঠাৎ থমকে গেল। কোনো উত্তর দিল না।

আমি আবার আব্দার করলুম, 'আমার মা-বাবা কোথায় সর্দার ?'

সর্দার গম্ভীর গলায় বললে, 'আমি জানি না।'

'কেন ?'

আমার এই প্রশ্ন শুনে হঠাৎ যেন রেগে ঝলসে উঠল সর্দারের চোখ ছুটো। গলার স্বরটা বেশ কর্কশ করেই সর্দার বললে, 'কেন-র উত্তর আমি দিতে পারব না।'

আমি কিন্তু ভয় পেলুম না। আমি বললুম, 'তোমরা তো সময় হলেই বাড়ি যাও। কত কী কিনে নিয়ে যাও। আমাকে তোমরা ছুটি দাও না কেন ? আমার কি ইচ্ছে করে না মা-বাবাকে দেখতে! বলো, আমার মা-বাবা কোথায় থাকে ?'

'চোপ!' হঠাৎ বাজখাঁই গলায় ধমক দিল সর্দার।

আমিও গলা উঁচিয়ে উত্তর দিলুম, 'কেন চুপ করব?'

বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে উঠে সর্দারের হাতটা আমার গালের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করল। তারপর ধমক মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার মুখের ওপর কথা!'

আমার ভীষণ লেগেছিল। আমি আহত গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে সর্দারের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালুম। বিশ্বাস করতে পারছি না, সর্দার আমায় মারল। আমি চোখের জল সামলাতে পারলুম না। কেঁদে ফেললুম। সর্দার ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি তখন একা। নিঃসহায়!

কাঁদতে-কাঁদতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম রাত্তিরবেলা। আমি জানতে পারিনি, আজকের এখন এই রাতটা কত গভীর। হয়তো আমি এমনি নিশ্চিন্তেই ঘুমিয়ে থাকতুম। কিন্তু হঠাৎ যেন কার হাতের ছোঁয়া আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল! আমি চোখ চাইলুম। এ কী! এ যে সর্দার। যে-গালে আমায় আঘাত করেছিল, আমার সেই গালে সে হাত বুলোচ্ছে। আমি চেয়ে আছি অবাক চোখে। সর্দার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বললে, 'জ্বলে উঠতে পারলি না? আমি যখন মারলুম, বসিয়ে দিলি না কেন আমার বুকে একটা ছুরি?'

আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলুম। সর্দার উঠে দাঁড়াল। ওই দরজার এক কোণে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকার কী ভয়ংকর নিস্তব্ধ! হঠাৎ সর্দার কথা কইল। প্রচণ্ড চাপা আর ভাঙা গলার স্বর। বলল, 'তোর বাড়ি আমি জানি না। কেননা, তোকে আমি রাস্তা থেকে চুরি করে এনেছি!'

সে-কথা শোনা মাত্রই যেন চমকে থেমে গেল আমার বুকের প্রাণটা। আমি উঠে বসে পড়লুম।

সর্দার বললে, 'তুই তখন অনেক ছোট। রাস্তার ধারে বসে বসে

খেলা করছিলি। তোর মা-বাবা হয়তো কাছেই ছিল। আমি তোর মুখখানা কাপড়ে ঢেকে ছুট্ দিয়েছিলুম। তাই তখন তোর কান্নাটাও বোবা হয়ে গেছল। কেউ টেরও পায়নি। তখন থেকে কাছে-কাছে রেখে তোকে বড় করেছি। ডাকাত বানিয়েছি।' বলতে বলতে সর্দার থামল। মনটা ঘৃণায় বিষিয়ে গেল আমার। আমি অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সর্দারের মুখের দিকে চাইলুম। তারপর বিছানায় মুখ গুঁজে আমার মা আর বাবার মুখ দু'টি ভাবতে লাগলুম। কিন্তু কিছুই ভেবে পাই না আমি, কিচ্ছু না।

আমি শেষ রাত্রের অন্ধকারেই লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম রাস্তায়। কেননা, এখানে আমার আর একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করছিল না। টের পেল না কেউ। এমন-কী, সর্দারও না। আমি জানি না কোথায় যাব। শুধু জানি ডাকাতদলের এই আস্তানাটা আজ আমার কাছে অন্ধকূপের মতো ভয়ংকর। আমি যেন পালাতে পারলেই বাঁচি।

আমি বাঁচিনি। কারণ, রাত কেটে কখন সকাল হয়েছিল, আমার খেয়াল ছিল না। আমি আনমনে হাঁটছিলুম। এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন আমার ঘাড়টা খপাৎ করে খামচে ধরলে। আমি চমকে পিছন ফিরেছি! দেখি, সেই লোকটা। অন্ধ ভেবে যে আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। লোকটা হয়তো এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠবে! কিন্তু কে দেবে চেঁচাতে! তার আগেই, তার পেটে মেরেছি এক ঘুঁষি! সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘাড় ছেড়ে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়েছে লোকটা। সেই তালে দে ছুট্! কিন্তু লোকটা নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলে, 'চোর, চোর।'

কেউ কিছু বোঝার আগেই, আমি এমন জোরে ছুট্ দিয়েছি যে, আর আমায় ধরতে হচ্ছে না। তবু তারা আমার পিছনে ছুটল। কিন্তু তখন তাদের নাগালের অনেক বাইরে আমি। আমি লুকিয়ে পড়েছিলুম। ওরা আমায় খুঁজে পেল না। লুকিয়ে পড়েছিলুম সামনে বেড়া দেওয়া মস্ত বাগানের মধ্যে। বাগানটার ভেতরেই একটু দূরে একটা ছোট্ট বাড়ি।

আমার মনে হল, জায়গাটা নিরাপদ। এখানেই আমি চুপটি মেরে ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিলুম।

আশ্চর্য, চারিদিক খুব নিঃঝুম হলেও বাগানের ভেতর থেকে একটা খসখসানি আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমি ঘাবড়ে গেলুম। তাই তো! কেউ দেখতে পেল নাকি! লুকিয়ে-লুকিয়ে অনেকক্ষণ পরেও যখন কাউকে দেখতে পেলুম না, তখন চুপিসারে ঝোপ সরিয়ে উঁকি মারলুম। এক-পা, এক-পা করে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখছি। হঠাৎ আমার চোখটা ধাঁধিয়ে গেল। দেখি কী, বাগানের মধ্যে একটা শিংওলা হরিণ। গাছের সঙ্গে বাঁধা। বাঁধন খোলার জন্য যতই সে পা ঠুকে ছটফট করছে, ততই গাছের শুকনো পাতায় খসখসানি আওয়াজ উঠছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভাবলুম, এখানে যখন হরিণ আছে, তখন নিশ্চয়ই কাছে-পিঠে হরিণের মালিকও আছে। কিন্তু হরিণটাকে দেখতে-দেখতে আমি মালিকের কথা ভুলেই বসেছি। সত্যি, কী সুন্দর দেখতে হরিণটাকে। হলুদ গায়ে ছোপ-ছোপ রঙ-বাহারি! চোখ দুটো টানা-টানা। শিং দুটো গাছের ডালের মতো আঁকা-বাঁকা। আমি অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমার এত ভাল লেগে গেল! আমি এবার এগিয়ে গেলুম। একেবারে হরিণটার কাছাকাছি। কেউ দেখতে পেলে আমায় যে শেষ করে ছাড়বে, এ-কথাটা আমার আর মনেই এল না। হরিণটাও আমায় দেখে কেমন যেন থ হয়ে গেল। ছটফটানি থামিয়ে আমার মুখের দিকে ঠায় চেয়ে রইল!

আমার সাহস বেড়ে গেল! ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলুম হরিণটার দিকে। তবে হরিণটার একেবারে কাছে যেতে গা ছমছম করছে। ওই মাথার শিং যদি আমার পেটে বসিয়ে দেয়! তখন?

কিন্তু কই, হরিণটা তো শিং নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে না। আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে খালি পা ঠুকছে। যেন ডাকছে আমায়। আমি আরও একটু এগিয়ে গেলুম। হাত বাড়ালুম। আমার হাতটা চেটে দিল। হরিণটা কি তবে আমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে? আমি হরিণটার কপালে

হাত দিলুম। কিচ্ছু বলল না। গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। হরিণটা আনন্দে ঘাড় দোলাল। আমি হরিণটার বাঁধন খুলে দিলুম। হরিণটা প্রথমে থমকে গেল। তারপর বাগানের মধ্যে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটতে লাগল। আমি ধরতে গেলুম। পালিয়ে গেল হরিণটা। আমিও পিছু নিলুম। হরিণটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আমিও চুপি-চুপি ঝোপের কাছে এসে লাফিয়ে পড়লুম। হরিণটা চোখের পলকে ভো-কাট্টা। যেন সে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিলে। আমার কী মজাই না লেগে গেল। আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম। হরিণটাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আমি আনন্দে ফুলের গাছগুলো মাড়িয়ে-মুড়িয়ে শেষ করে ফেললুম। তবু হরিণটাকে ধরতে পারলুম না। তখন আমি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাক দিলুম, 'আঃ। আঃ।' আশ্চর্য, হরিণটা ভয় পেল না। আমার কাছেই এল। আমার পেটের মধ্যে মুখটা গুঁজে আমায় আদর করতে লাগল। আমার কাতুকুতু লেগে গেল। আমি খিলখিল করে হেসে ফেললুম। আমি হাসছি আর হাসছি। কখন যে হরিণের মালিক বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকেছিল, আমার নজর পড়েনি। কতক্ষণ যে সে আমার দিকে চেয়ে আমার হাসি শুনেছিল, তাও আমি জানি না। হঠাৎ দেখতে পেয়েছি। তাকে দেখেই চুপসে গেল আমার হাসি। দেখি, লোকটার মাথায় একটা তালপাতার টুপি। কাঁধে একটা তীর-ধনুক। খালি গা। কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু। মালকোঁচা মারা। আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। লোকটা হঠাৎ গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

বলব কী, সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা তীরবেগে ছুট দিলে। ছুটতে-ছুটতে বাগানের বেড়া টপকে একেবারে বাগানের বাইরে। আমিও তাই দেখে মার ছুট্। সটান হরিণটার পেছনে। লোকটা এবার ব্যস্ত হয়ে হেঁকে উঠল, 'চোর, চোর।' আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। লোকটা আমায় চোর বলল কেন? তবে কি আমায় চিনে ফেলেছে? না, ভাবছে হরিণটাকে আমি চুরি করে পালাচ্ছি? এবার আমার শেষ।

তবু রক্ষে, কাছে-পিঠে কেউ ছিল না। আমায় ছুটতে দেখে কেউ আমায় ধরতে এল না। কিন্তু লোকটার হাত থেকে ছুটে এল ধনুকের ছিলা ছিট্‌কে একটা ফলা আঁটা তীর। একেবারে আমার পায়ের গোড়ালির মধ্যে বিঁধে গেল। আমি টাল সামলাতে পারলুম না। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে পেছন ফিরে দেখি, পায়ের ভেতর তীরটা আটকে আছে। টেনে খুলে ফেলতেই ঝরঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল। আমি উঠে পড়লুম। দেখতে পেলুম হরিণটাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লোকটাও ছুটে আসছে। আমি পালাতে গেলুম। পারলুম না। ভীষণ যন্ত্রণায় খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ঘুরপাক খাচ্ছি। লোকটা ছুটতে-ছুটতে কাছে এসে গেল। আমি বোধহয় ধরা পড়ে গেলুম। কিন্তু আশ্চর্য, আমায় ধরার আগেই, হরিণটা তীরের মতো লাফিয়ে এসে লোকটার পেটে মেরেছে এক ঢুঁ! সে একেবারে মাটির ওপর চিতপটাং। হকচকিয়ে গেছে। তড়বড়িয়ে উঠতে গেছে যেই, হরিণটা আবার দিয়েছে এক গোঁত্তা। আবার মেরেছে। লোকটা মাটির ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। এই রে। হরিণটা বুঝি ওকে মেরেই ফেলে। না, কোনো রকমে সামলে নিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েই মার ছুট্। মাটিতে যে মাথার টুপিটা পড়ে রইল সেদিকে তার খেয়াল নেই। হরিণটাও ছাড়বে না। পেছনে তাড়া দিয়ে, এমন গুঁতিয়ে মারলে, যে লোকটা জেরবার।

এখানে আমার আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। এই ফুরসুতে পালাতে হবে। আমি মাটিতে পড়ে-থাকা টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় দিলুম। কেউ দেখলে চট্ করে আমায় চিনতে পারবে না। মাথায় তালপাতার টুপি পরে আমি ভারী কষ্ট করে দ্রুত হাঁটতে লাগলুম। আমি দেখছি, আমার পায়ের ক্ষত দিয়ে রক্তের ফোঁটাগুলি মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ছে। এই রক্তের ফোঁটাগুলি দেখে-দেখে কেউ যে আমার হদিস পেয়ে যেতে পারে, এ-কথা মনে হতেই আমার বুকটা ভয়ে শুকিয়ে গেল।

কিন্তু এই ভয়ের চেয়ে এখন পায়ের যন্ত্রণাটাই আমায় অসহ্য কষ্ট

দিচ্ছে। এই কষ্ট নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আমি আর কোথাও যেতে পারলুম না। নিজেদের আস্তানাতেই ফিরে এলুম। বাঁচতে হলে এই আস্তানাতেই ফিরে আসতে হয়। অন্তত লুকিয়ে তো থাকতে পারব। কিন্তু আশ্চর্য, আস্তানাতে কেউ নেই। কাউকে তো দেখতে পেলুম না। না আছে সর্দার, না অন্য কেউ। এমন-কী, কোন জিনিস-পত্তরও তো দেখছি না। তবে-কি আস্তানা ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। নাকি ধরা পড়েছে। তাহলে তো, আমারও বিপদ। কিন্তু এখন আর আমি বিপদের কথা ভাবতে পারছি না। পায়ের প্রচণ্ড ব্যথায় আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না। মাটির ওপরই বসে পড়লুম। তারপর পায়ে হাত দিয়ে ছটফট করতে-করতে মুখ গুঁজে এলিয়ে পড়লুম।

আমি যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলুম আর মনে-মনে ভাবছিলুম এখন আমি কী করব। এত কষ্টেও হরিণের কথাটা আমার বার-বার মনে পড়ছিল। নিজেকে নিজেই আমি ঘৃণায় ধিক্কার দিয়ে উঠলুম। ছিঃ ছিঃ! আমি ডাকাত। আর ওই একটা ছোট্ট প্রাণী, কত সুন্দর।

আঃ! চমকে উঠলুম। আমার পায়ের ক্ষতটা কে যেন চেটে দিচ্ছে। পা সরাতে গিয়ে দেখি, এ কী। এ যে সেই হরিণটা। কোথা থেকে এল। তবে কি ও পথের ওপর আমার পায়ের রক্তের চিহ্ন দেখে-দেখে এসেছে এখানে। আমি ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। আমার চোখের দুফোঁটা জল মাটিতে পড়ার আগেই ও যেন মাথা পেতে দিল। কী জানি কেন, তখন যেন আমার মনে হল, আমি আবার দাঁড়াতে পারব। আমি দাঁড়ালুম। আমার মনে হল, তীর-বেঁধা আমার পায়ের ক্ষতের যন্ত্রণা হরিণের মুখের ছোঁয়া পেয়ে যেন জুড়িয়ে আসছে। আমি পা ছুঁড়ে লাফ দিলুম। আমার লাগল না। আমি চরকি খেতে-খেতে ছুটতে লাগলুম। কষ্ট হল না। তবে কি বনের কোনো ওষুধ মুখে এনে হরিণটা আমার পায়ে লাগিয়ে দিল। আমি হরিণের গলাটা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলুম। হরিণটা বসে পড়ল। যেন বলছে, আমার পিঠে বোসো। আমি হরিণের পিঠে লাফিয়ে বসলুম। আমার মাথায় সেই

তালপাতার টুপি। আমাকে পিঠে নিয়ে তীরবেগে ছুটল হরিণটা।
আমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে হেসে উঠলুম।

ছুটতে-ছুটতে এ কোথায় নিয়ে এল হরিণটা আমায়। এদিকে তো আমি কোনোদিন আসিনি। হরিণের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুট্ দিলুম। সবুজ ঘাস। কখনও দেখি, ঝাউগাছের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক পাখির নাচ। কখনও দেখি, অনেক ফুলে অনেক ফড়িং দোল দিচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ঝরনা যেন জলতরঙ্গের বাজনা বাজচ্ছে। ঝরণার জল ছড়িয়ে-ছড়িয়ে গায়ে মাখলুম। মুখে ছিটোলুম। আঃ, কী ভাল লাগছে। তারপর শুয়ে পড়লুম পাথরের গায়ে। শুয়ে-শুয়ে আকাশের ছায়া দেখতে লাগলুম। আকাশের গায়ে-গায়ে মেঘ ভেসে যায়। কখনও সে-মেঘ আকাশের গায়ে হাঁসের ছবি এঁকে দিচ্ছে। উড়তে-উড়তে সে-হাঁস কখনও বাঘ, কখনও হাতি, নয়তো একটা মস্ত দানব। তারপর চেয়ে দেখি, মস্ত দানবের পেছনে-পেছনে জুড়ি ঘোড়ার রথ ছুটিয়ে ধেয়ে আসছে এক বীর পুরুষ। হাতে তার বর্শা। তার পেছনে এক বীর নারী। ওরা বুঝি মারবে দানবটাকে ওই বর্শার ঘা। হয়তো তাই। কেননা, ওই দানব যে ওদের ছেলেকে চুরি করে পালিয়েছিল। আজ ধরা পড়েছে।

চমক ভাঙল আমার। ভাবলুম, আমিই কি ওদের সেই ছেলে? ওই বীর নারী আর ওই বীর পুরুষ, ওরাই কি আমার মা আর আমার বাবা? হাওয়া উঠল। এলোমেলো হয়ে গেল মেঘের ছায়া। হারিয়ে গেল আমার মায়ের ছবি। আমার চোখ উপচে জল নামল। আমি কেঁদে ফেললুম।

হঠাৎ হরিণটা কাছে এল। আমার পাশে পাথরের ওপর বসল সে। আমার গায়ে মাথা ঠেকাল। কান্না-চোখে তার দিকে তাকালুম একবার। তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলুম। আদর করতে-করতে ক্লান্ত চোখ দুটি আমার বুজে এল। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

———

হাতি-ধরিয়ে নায়ার

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পালখোড়ের ছেলে নায়ারের জন্ম যেন হাতি ধরার জন্যেই। নতুন কিছু নয়। নানা হাতি ধরত। সেবা-যত্ন করত নানি। বাপ-চাচা ধরত। মা-চাচি তার মুখে তুলে দিত খাবার। ভুষি, গুড়, থোড়, ঘাস এইসব। হাতি হত তাদের পালিত। রাজা-রাজড়াদের আমল থেকেই কেরালার তেকডি, উমাডি, কাছিতোড, বার্লিয়ার, পারচেকুডম প্রভৃতি জঙ্গল থেকে হাতি ধরা হত। তখনকার দিনে জঙ্গলে হাতির কোনও গোনাগুনতি ছিল না। রাজকাজে ছাড়াও, পরবর্তী সরকারের কম্মে লাগার পর, লকড়ি টানার কাজে হাতিই ছিল এক এবং অদ্বিতীয়। আজও আসাম ও উত্তর বাংলায় এই হাতিই জঙ্গল থেকে কাঠ রেল-ওয়াগনে ভরে দেয়, লরি ভরাট করে। দক্ষিণী হাতি সারকাসেও বড় কম নেই।

নায়ারের পুরো নাম কে কুট্টন নায়ার। বয়েস ৫৪। মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় ওয়াইলড লাইফ স্যাংকচুয়ারির হাতি-ট্রেনার! পাঁচ-পাঁচটি হাতি এখন তার হেপাজতে। দাঁতাল গোধনই দলের একমাত্র পুরুষ। বাকি চারজন—লতা, কল্যাণী, তারামতি আর তুফান মাদা। লতার

বয়েস ৪০, কল্যাণীর ৫০। বাকি দুই, গোধনসুদ্ধ ১৮-১৯।

বারলিয়ার জঙ্গল থেকে ধরা পাঁচ-পাঁচটি হাতি মধ্যপ্রদেশ সরকার কেরল থেকে কিনলেন। হোসেঙ্গাবাদে কাঠ বওয়ার কাজ তাদের। সেই তাদের সঙ্গেই দেশ ছাড়ল নায়ার। আর দেশে ফেরেনি। হোসেঙ্গাবাদ থেকে কানহায়। মাহুত নায়ার হাতি চড়িয়ে কানহার জঙ্গলে শের দেখিয়ে বেড়ায় ট্যুরিস্টদের। সেখান থেকে বান্ধবগড়ে এই বছর-চারেক।

এদিককার সমস্ত অভয়ারণ্যই ১ নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খোলার কথা। আমরা দিন-তিনেক আগে পৌঁছে বনপাল ভজিয়ে উমারিয়া থেকে বান্ধবগড়ে এসে পড়েছি। দখল নিয়েছি বাংলোর। কাঁচা সবজি চাল ডাল নুন বয়ে এনেছি। লকড়ির তো অভাবই নেই। চমৎকার চার-ঘরা কাঠের বাংলো। মাঝে ড্রইং-ডাইনিং। প্রধানত আমলকী বনের মাঝখানেই আমাদের বসবাস। অ্যাসবেসটসের ছাদ ভরা মুন ফ্লাওয়ার। সামনে করমচা ঝোপ। মরামের রাঙা পথ দিগ্‌বিদিকে বেরিয়ে গেছে। কাঁকরের ডাকে ঘোর কাটে। একটা ঝম-ধরানো ভাব সর্বত্র। সেই ভাবের কাঁথা সেলাই করে উড়নচণ্ডি ঝিঁঝি।

হাতে আমাদের একটা ভাড়া-করা সাদা অ্যামবাসাডার। জব্বলপুর থেকে আজ দিন-দশেক হল ট্যাঙশ-ট্যাঙশ করে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মারবেল-সফেদ গাড়ি। জঙ্গল কিন্তু এসব গাড়ির কদর করে না। তার চাই জিপ-জোঙ্গা। পাব কোথায়? এখনও সীজন শুরু হয়নি। গাড়িঘোড়া হুজুরে হাজির নয়। হাওদায় রং পড়ছে। বাথরুমে গিজার আঁটা হ্চ্ছে। কটগুলো হচ্ছে রং-এ রং-এ রঙিন। দেয়ালে নতুন ডিসটেম্পার। জঙ্গলে একটা সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে।

দুপুরের খাওয়া সারা। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। নায়ার পুরনো হাওদা গোধনের পিঠে চাপিয়ে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে। আমরা তড়িঘড়ি তৈরি। বাংলোর পেছন দিকে গোধন আমাদের নিয়ে জঙ্গলে।

আকাশের কোণে হালকা ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ। নায়ারের বাঁহাতে ডাণ্ডশের বদলে একটা টাঙিকছমের জিনিস। পড়লুম গিয়ে ঘাসের সমুদ্রে। কোমর-উঁচু বাঘ-ঘাসের ভেতর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল গোধন। ঘাস খুঁড়ে চলেছে, নায়ারের সতর্ক দুচোখ—এদিকে-ওদিকে। বলল, এই ঘাসবনই হল আসল টাইগার-কভার। বাঘ এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুযোগমতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হরিণের ওপর। হরিণ ছাড়া, বাগে পেলে বুনো শুয়োর। বাচ্চা মোষ বা বাছুরের মাথা এখানে-ওখানে। ইতস্তত হাড়—বিশেষ করে ঘাসের বিছানা যেখানে দড়ি-দোলনার খোলের মতন হয়ে আছে, সেখানে। নায়ার বলে, বনরাজের বিছানা। উনি শুয়ে-বসে খান। প্রায়ই 'কিল'-এর ব্যবস্থা থাকে। বাছুর মোষ বাঁধা হয়। পর্যটক ত্থাখে ঐ অবস্থায় 'অ্যালার্ম কল' দেয় বাঁদর-হনুমান গাছের চুড়ো থেকে। সেই আওয়াজ আরো দীর্ঘ জোরালো করে টেনে দেয় চিতল, কৃষ্ণসার। জঙ্গল এক অজানা অথচ নিশ্চিত ভয়ে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ একটা ঝাঁঝালো গুমোট গন্ধ নাকে ঝাপ্‌টা মারে। নায়ার ঠোঁটে আঙুল তুলে সতর্ক করে আমাদের। কাছাকাছি বাঘ আছে, আছেই। নায়ার তার গোধনকে খুব হুঁশিয়ার করে দেয়। কেঁদ পলাশ বয়ড়ার ঝোপের মধ্যে পর পর চারটে চিতল। পথে যেখানে পাতা পড়েনি, সেখানে মাটি-বালির ওপর বাঘের পায়ের ছাপ বা পাগ-মার্ক দেখে বুঝে নেয় নায়ার, বাঘ কোন্‌দিকে গেছে। মার্ক নতুন, না পুরনো—তাও বুঝে নেয়। আর সেইমতো গোধনকে চালনা করে।

প্রকৃত কোনও পথ নেই জঙ্গলে। বিশেষ করে হাতির জন্যে। সে পথ করে নেয়। নির্দেশ পেলে একটা ষাট-সত্তর ফুট কেঁদ গাছ উল্‌টে দিতে দু সেকেণ্ড। বাঁশ আমলকী বুনো কুলের ঝোপের পাশ দিয়ে জঙ্গল ঠেঙিয়ে বেড়াল গোধন ঘণ্টা-দুয়েক। সন্ধার দেখলুম, হরিণ দেখলুম কতশত, শেরের দেখা নেই। শের মেলে ভাগ্যে। নায়ার

আমাদের বাংলোয় নামাল সন্ধে-সন্ধে। বলল, 'কাল সুবে পাঁচ বাজে আপলোগ রেডি হো যাইয়ে। শের জরুর মিলনা চাই।'

খোড়ার যেমন লাগাম, গাড়ির স্টিয়ারিং, হাতির কী? হাতির দু' দুটো কুলো-কানের ওপরে মাহুতের পায়ের পাতা। কাজ করে দুটো বুড়ো আঙুলই। কিসের জন্যে, কেমনধারা চাপ—জেনে গেছে হাতি। শের কী পাঞ্জা মাহুতই বোঝে, হাতি নয়। যেভাবে চলতে বলবে, সেভাবেই চলবে হাতি। অন্যথা নেই।

'বয়েস কীভাবে বোঝো?' নায়ারকে জিজ্ঞেস করি।

'কান দিয়ে। বয়েস যত বাড়ে, কুলোকান তত মুড়তে থাকে। তাছাড়াও পাঞ্জার বেড় দিয়েও বয়েস আঁচ করা যায়।'

'মোটামুটি বাঁচে কতদিন?'

'একশো-বিশ তো হোবেই। জ্যায়দা ভি হো সক্‌তা।'

নায়ারের বউ কল্যাণাম্মা। হাতির খাওয়া-দাওয়া সমস্ত তারই হাতে। এক নাতিন আছে ঘরে। সেও নানির সঙ্গে হাতির সেবা-যতন করে। কল্যাণাম্মা খেতে না দিলে সেদিন সবার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। ৩৪ বছর স্বামীর সঙ্গে এই একই কাজ সে করে যাচ্ছে। খাবার ব্যাপারটাও বড় আশ্চর্যের। ধরো, দশ কিলো চালের ভাত খায় রোজ। তুমি একদিন পরীক্ষা করার জন্যে এগারো কিলো চাল নিলে। ভাত করলে। খেতে দিলে। ঠিক কিলোটাক ভাত বালতিতে পড়ে থাকবে। তোমার আমার মতন না, দু পদের বদলে দশটা পদ হলে কণ্ঠা পর্যন্ত খেয়ে নিলুম। তার পর কুমড়ো-গড়ান।

আরও একটা অদ্ভুত কথা বলল নায়ার। ধরো, তুমি চা-দোকানের সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে চা খেতে দোকানে ঢুকলে। গোঁসা হবে। অথচ হাতির ওপরে বসে খাও। কিচ্ছু মনে করবে না। ওর মান-অপমানবোধ অত্যন্ত কড়া। ভালবাসা, মাহুতের জন্যে, পুরোটাই জমা থাকে। খরচ হয় না।

নায়ার মাইনে পায় আড়াইশো টাকা। বললুম, 'ধরো যদি তুমি অনেক টাকা মাইনের একটা চাকরি পাও, হয়তো শহর-বাজারে। তুমি যাবে ?'

'কভি না, বাবু। মরেঙ্গে, তব ভি এ-কাম নেই ছোড়েঙ্গে।' কেরলের জিভ হিন্দি নাড়াচাড়া করতে করতে উত্তর দিল। 'চাকরি শেষ হলে, করবেটা কী ?' 'দেশ যাব। জঙ্গলে ঘুরব-ফিরব। হাতি ধরব। সরকারকে দিব। না ধরতে দিলে, হাতি ট্রেন করব, সরকারে-বেসরকারে। লগ্ টানা কাজে হাতির এখনও বহুত কদর, বাবু।'

লালুর কারসাজি

মনোজিৎ বসু

লালু হচ্ছে মুচির ছেলে।

বয়স তার বেশী নয়, এই দশ কি এগারো।···জুতো মেরামত করতে পারে না, কিন্তু বুরুশ করতে ওস্তাদ। ভোর না হতেই কালি আর বুরুশের ছোট্ট ঝোলাটা নিয়ে সে বেরিয়ে গান করতে শুরু করে দেয় :

'একটি পয়সা দাও গো বাবু
একটি পয়সা দাও—
ময়লা জুতো সয় না পায়ে
পালিশ করে নাও···?'

খদ্দের জুটতে দেরি হয় না। সে চট্‌পট্ জুতোয় কালি লাগায় বুরুশ করে আর গান গায়। খদ্দের খুশি হয়ে ওর প্রাপ্য একটি পয়সার সঙ্গে আরেকটি পয়সা বকশিস দিয়ে বসে।

কিন্তু কলকাতায় দুষ্টু লোকেরও তো অভাব নেই! এই তো দিন কয়েক আগে চশমা পরা একটি বাবু ওকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নিয়ে সরে পড়েন, আর ফেরেন না।···

লালু মনে মনে সেদিন বুঝে উঠতে পারেনি যে ভদ্রলোকেরও কেন এমন মনোবৃত্তি হয়! তাও সামান্য একটা পয়সার জন্যে।···

এই ঘটনার দিনকয়েক পরের কথা। সেদিন খদ্দেরের অন্ত নেই। লালু জুতো পালিশ করে যাচ্ছে, আর গান গেয়ে চলেছে মিষ্টি মধুর গলায়।

একটি বাবু তো ওর গান শুনেই একটি পয়সা দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু লালু তাঁকে থামিয়ে বললে, 'কই, আপনার জুতো তো পালিশ করিনি বাবু! জুতো পালিশ করিয়ে নিন, তারপর না হয় একটা পয়সা বকশিস্ দেবেন আরো।'

বাবু ওর কথায় খুশী হয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নেন। আর যাবার সময় দুটো পয়সা বখশিস্ দিয়ে যান। লালু ভাবে এমন লোকও তবে আছে।···

লালুর খদ্দের কমে এসেছে। এমন সময় সে দেখতে পেল, পয়সা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সেই বাবুটি আসছেন ওদিক থেকে।···

লালুর মাথায় এক ফন্দি খেলে গেল। সে বললে— বাবু, একবারটি পালিশ করিয়ে নিন, দেখবেন জুতো কেমন ঝকঝক করে। পয়সা আজ না থাকে আরেকদিন দেবেন। আসুন।'

বাবু ভাবলেন, 'মন্দ কি! পালিশটা করিয়ে নিই তো তারপর পয়সা। একবার সরে পড়লে, কে আর ধরে!'

ছোট কাঠের বাক্সটার উপর বাবু পা রাখেন, লালু পালিশ করে। সেটা পালিশ হয়ে গেলে বাবু তাঁর জুতোসুদ্ধ বাঁ পা-টা বাক্সের ওপর তুলে ধরেন। 'নে এটা পালিশ কর।'—লালুর দিকে চেয়ে বাবু বলেন।

ঘাড় নেড়ে লালু জবাব দেয়, 'না, বাবু একটাই থাক্। আগে সেদিনকার পয়সাটা ফেলুন, তারপর ওটা হবে।'

লালুর কথা শুনে বাবু তো অবাক! ছোঁড়াটা বলে কি! আচ্ছা চালাক তো! আরেক পাটি জুতো পালিশ না করলে যা বিচ্ছিরি

দেখাবে!…মহা মুস্কিল।…বেশি দেরি করলে ছোঁড়াটা হয়তো লোকজনও জোটাতে পারে!…কাজ নেই বাপু অত হাঙ্গামা করে, তার চেয়ে পয়সা দুটো দিয়ে দেওয়াই ভাল। এই ভেবে বাবুটি তখন লালুকে দুটো পয়সায়ই দিয়ে বললেন, 'নে বাপু, খুব আক্কেল হয়েছে, তাড়াতাড়ি এখন এটা পালিশ করে দে।'

পয়সা পেয়ে লালু তখন বাকী জুতোটা পালিশ করে দেয়। আর যাবার সময় বাবুর দিকে চেয়ে বলে ওঠে, 'মনে রাখবেন বাবু, কাউকে ঠকালে নিজেকেই শেষটাই ঠকতে হয়।'…লালুর কথা শুনে বাবুটি লজ্জায় মরে যান।

উলবার্গের কবর খনক

বিমল দত্ত

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী উল্‌বার্গ নামক সহরের কবর-স্থানটা ক্রমে ক্রমে যখন ভর্তি হয়ে আসতে লাগল তখন সহরের কর্তৃপক্ষরা নূতন কবর স্থানের ব্যবস্থা করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু তাই বলে মৃত্যু থেমে রইল না। রোজই একটা দুটো শব কবর-স্থানে হাজির হতে লাগল। মুস্কিল বাধল বৃদ্ধ কবরখনক জিমি কোল্‌-ম্যানের। রোজ রোজ সে অত জায়গা পায় কোথা? তবুও অসামান্য স্মৃতিশক্তি থাকায় সে কোন রকমে এতকাল জায়গা করে দিয়েছে। কিন্তু এবার আর বুঝি সে পেরে ওঠে না।

ঠিক এই সময়ে উল্‌বার্গের এক ধনী বণিক মারা গেলেন। কবর-কর্তৃপক্ষ জিমির উপর হুকুম চালালেন—'পুরানো কবর-স্থানে ধনী বণিকের জন্য একটি জায়গা করে দাও।'

জিমি তখন বৃদ্ধ হয়েছে। শাদা চুল আর দাড়িতে তার মাথা ও মুখ ছেয়ে গেছে—কিশোর বয়স থেকে সে এই কবর-স্থানের কবরখনক। কত লোকের জন্য অন্তিম শয়নের সে ব্যবস্থা করেছে কিন্তু এবার বুঝি তার পক্ষে আর স্থান করে দেওয়া সম্ভব হয় না।

সে তার শাদা দাড়ির মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে তার ঘোলাটে দু' চোখে কর্তৃপক্ষের মুখের দিকে চেয়ে চিন্তিতভাবে উত্তর দেয়, 'দেখুন, আমার যতদূর মনে হয় এ কবর-স্থানে আর তিল ধারণের স্থান হবে না।

এর প্রতিটি ইঞ্চি ঘাসের চাপড়ার তলায় কারুর না কারুর মৃতদেহ শেষ শয়নে শুয়ে ডুম্‌স্‌-ডের শেষ বাজনার সুর শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে—তাদের ঘুম অকালে ভাঙাবার কি অধিকার আছে আমার? তা সত্ত্বেও যদি আমার উপর এরূপ হুকুম করেন, তা হলে আমার কোদাল হয়ত এমন জায়গায় পড়বে যেখানে কোন না কোন মৃতদেহ এখনো টাটকা অবস্থায় রয়েছে। তার দেহ ধূলায় মিশে না গেলে ত আমি তার কবরের ঘুম ভাঙাতে পারি না।'

কিন্তু তবুও তার উপর হুকুম হল। 'অন্ততঃ আর একটা—শুধু একটা কবর খুঁড়ে তৈরি কর—সেই কবরের নিচে উল্‌বার্গের ধনী বণিক তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের শেষে চিরনিদ্রায় বিশ্রাম করবেন।'

ম্যাপ ও চার্ট দেখে অগত্যা জিমি একটা জায়গা বেছে ঠিক করলে। কিই-বা সে করতে পারে এ ছাড়া? হুকুমের চাকর ছাড়া সে ত' আর কিছু না!

জিমি কোদাল নিয়ে কবর-স্থানে গিয়ে হাজির হল। চেরিফলে কবর-স্থান অতি মনোরম দেখাচ্ছে—সবুজ ঘাসের ডগায় ভোরের শিশির মুক্তার মত জ্বলছে—সমস্ত জায়গাটা ঘিরে একটা নিস্তব্ধ বিষাদ। জিমি কোদালের ঘা মারতে লাগল অন্যমনস্ক ভাবে। তাঁর হাত কাঁপছে বুকের মধ্যে কিসের যেন একটা বেদনা—মনে মনে আকুল প্রার্থনা ভগবানের কাছে—'হে ভগবান, অপরাধ নিও না—শুধু হুকুমের খাতিরে আজ আমি মৃতের নিদ্রা ভঙ্গ করতে এসেছি—ধনী মৃতের জন্য শেষ শয়ন রচনা করবার জন্যই আমার এই অনধিকার চর্চা—ক্ষমা কোরো, প্রভু যীশু, আমায় ক্ষমা কোরো—'

কোদালের ঘা মেরে মেরে মাটির চাঁই তুলতে লাগল বৃদ্ধ জিমি। কিছুক্ষণ বাদে ঠং করে কিসে কোদাল লাগল। জিমি দেখলে একসার ইট। সে অতি সাবধানে নরম ইট একখানি করে তুলতে লাগল। সাবলের আঘাতে ইট ছাড়াতে ছাড়াতে জিমি হঠাৎ এক লাফে পাশে সরে এল। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। সে নাক

রুমাল দিয়ে বেঁধে আবার কাজে লাগল। কি করবে সে! কর্তাদের হুকুম। আবার একটু সরে এসে সে মাটির চাঁই তুলতে লাগল। একটা কোপ মারার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল কোদালটা যেন হড়কে গেল। বোধ হয় কোন নরম জিনিসে লেগেছে। কোদাল ও মাটি পরীক্ষা করে জিমি দেখলে একটা মৃতদেহের পায়ের কতক অংশ কোদালের সঙ্গে উঠে এসেছে। আর কাজে অগ্রসর হওয়া যায় না। জিমি খোলা গর্তটায় আবার মাটি দিয়ে ভরাট করে অফিসে ফিরে এল।

সমস্ত দিনটা জিমির কেমন এক অস্বস্তিতে কাটল। কোন কাজেই তার যেন আর উৎসাহ লাগে না। সে পুরাণো বৃদ্ধ বন্ধুদের 'পোকার' খেলার আড্ডায় গেল কিন্তু কিছুক্ষণ খেলা দেখে আর তার ভাল লাগল না।

সে সন্ধ্যার পরেই নিজের কুঠুরিতে ফিরে এল। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর জিমি ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমের মাঝেও যেন কি এক অশান্তি বোধ হতে লাগল তার। সহসা তার ঘুম ভেঙে গেল—সে উঠে বসল খাটের উপর।

কিন্তু ও কে তার ঘরের মধ্যে তারই টেবিলের সম্মুখের চেয়ার দখল করে বসে আছে? বেশভূষায় কোন গ্রাম্য লোক বলেই বোধ হচ্ছে। কিন্তু লোকটা এত রাত্রে তার ঘরেই বা বসে রয়েছে কেন।

সহসা একটা ভ্যাপ্‌সা পচা নর-মাংসের গন্ধ তার নাকে এল। ঠিক সেই রকম গন্ধ—যে রকম গন্ধ আজ কবর খোঁড়ার সময় সে পেয়েছে। কিন্তু সেটাকে সে মনের ভুল বলেই উড়িয়ে দিলে। গলা পরিষ্কার করে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কে মশাই?'

জিমির কথা শুনে লোকটা বিকট অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে দিলে, 'হ্যা হ্যা হ্যা চিনতে পারছ না আমায়! তা চিনবে কি করে? আমি যে উলবার্গের বাজারের সামান্য মুদির দোকানী—আমি ত আর ধনী বণিক নয়।'

হাসি শুনে এবং কথার মানে বুঝে জিমির শরীরের মধ্য দিয়ে যেন

একটা হিমের স্রোত বয়ে গেল। তবুও দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে জিমি বললে, 'উলবার্গের বাজারের মুদির দোকানী? সে ত জেমস্ উইলিয়মসন!'

আবার হেসে উঠল আগন্তুকটি—আবার সেই রক্ত-হিমকরা অট্টহাসি—'হা হা হা জেমস্ উইলিয়মসন ত' সেদিনের ছোকরা—ও ত' আমার দোকান—আমি—আমি—এই যে আমি গো—' বলতে বলতে লোকটা জিমির বিছানার কাছে এগিয়ে এল। তার ভীষণ মূর্তি দেখে জিমির সর্বশরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—লোকটার গায়ে ছেঁড়া পাজামা আর কেটে—অনাবৃত অংশ থেকে মাংস গলে পড়ছে—চক্ষুর কোটর শূন্য—মুখে মাংস না থাকায় তা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময়।

লোকটা তার কদর্য চোয়াল নেড়ে বিকট মুখভঙ্গি করে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, এইবার চিনতে পারছ বোধ হয়, না? আমি উইলিয়াম্ ব্র্যাকহার্ডি—হাঁ, সে-ই—যে ব্র্যাকহার্ডি দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছিল! বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম—স্নিগ্ধ শান্তির ঘুম—মাটির বুকের স্তব্ধতায় সমস্ত ভুলে—তুমিই আজ আমার ঘুম ভাঙিয়েছ—এই দেখ নিষ্ঠুর কোদালের ঘা লেগে পায়ের খানিকটা উঠে গেছে'···

জিমি আর কিছুই শুনতে পেলে না। সে শয্যার উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত তাকে উঠতে না দেখে কবর-স্থানের মালি এসে তাঁর দরজায় ঘা দিলে! কোন শব্দ নেই। অবশেষে দরজা ভেঙে ফেলায় দেখা গেল জিমি ঘরে নাই। তার পরিবর্তে তার খাটে একটা প্রমাণ সাইজ কঙ্কাল শয়ান রয়েছে। সে কঙ্কালে চামড়া, মাংস, মেদ, মজ্জা কিছুমাত্র নাই। কোন হিংস্র ক্ষুধার্ত পিশাচে তাকে চুষে খেয়ে ফেলেছে।

এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে বুকে ক্রুশ আঁকতে আঁকতে আর যীশু মেরির নাম করতে করতে মালি অফিসে খবর দিতে ছুটলো।···
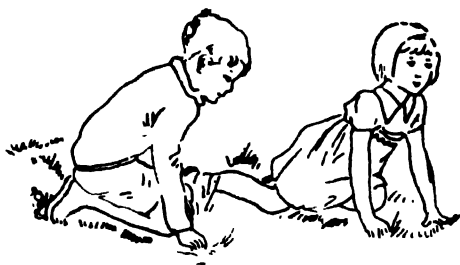
অপরাধ

রামনাথ বিশ্বাস

আফগানিস্থানের 'হিরাত' সহরে যখন গেলাম তখন দেখলাম সেখানে বড় বড় পথ খোলা হয়েছে। নূতন ধরনের দোকানপাটও বসেছে, শুনলাম বড় বড় সহরের মত সেখানে স্নানাগার, হোটেল, রেস্তোরাঁ তৈরি হবে ঠিক হয়েছে, কিন্তু তখনও পুরোদমে শুরু হয়নি—কারণ তখন সেখানে ভয়ানক শীত। শীতের কুয়াশায় ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে দেখতাম কখন আকাশ পরিষ্কার হবে।

হিরাতে আমি একজন হিন্দুর বাড়ীতে থাকতাম। ক্রমশঃ হিরাতের একজন বাঙালি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। তিনি এসে মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং হিরাতের নানা কথা আর গল্প শোনাতেন! ইচ্ছেটা তাঁর আমাকে 'হিরাতে'ই আটকে রাখা, কিন্তু আমার মন তখন চঞ্চল। আমি ভাবতাম রাশিয়ায় যাই কি পারশ্যে যাই? রাশিয়ায় যাবার ইচ্ছাটাই তখন প্রবল, কিন্তু আমি জানতাম যে যদি রাশিয়ায় যাই তবে আর পৃথিবী ভ্রমণ আমার হবে না। কাজেই যে প্রকাণ্ড বড় পথটা হিরাতের দিক থেকে চলেছে রাশিয়ার দিকে, আমি সেই পথের ধারে গিয়েই মাঝে মাঝে বসতাম। তখন দেখতাম নানা রকমের বাসন-কোসন রকমারি মালপত্র আর পেট্রল, গাড়ি বোঝাই হয়ে আসছে হিরাতে।

'হিরাত' হলো আফগানিস্থানের একটা নামকরা বাণিজ্যকেন্দ্র। ভারতবর্ষ থেকে অনেক আফগান ব্যবসা-বাণিজ্য করে 'হিরাতে' ফিরে যায়। তারা গিয়ে সাধারণতঃ থাকে 'সরাই-এ হিন্দ' বলে একটা হোটেলে। কাজেই ওদেশের যারা 'হিন্দুস্থানে'র খবরাখবর পেতে চায় ওখানে গিয়েই তারা আড্ডা মারে। আমিও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বসতাম, কত কথা শুনতাম তার ইয়ত্তা নেই। আমার ধারণা ছিল আফগান যুবকরা সাধারণতঃ হয় উচ্ছৃঙ্খল, সেইজন্য এসব ছোকরাদের সঙ্গে কথা ত বলতামই না উপরন্তু যদি কেউ যেচে কথা বলতে আসতো, আমি সেদিকে কান না দিয়ে চুপ করে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করতাম।

যাক, এখন ডাক্তারবাবুর কথাটাও একটু বলে নিই।

আমাদের ভারতীয় ডাক্তারবাবুটি জাতে বাঙ্গালি, ধর্মে মুসলমান, কিন্তু আমাকে বড় সুনজরে দেখেছিলেন। আর সেইজন্য আমাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণও করতেন। একদিন আমি আমার আস্তানায় অর্থাৎ সেই হিন্দুটির ঘরে বসে আছি এমন সময় সেই ডাক্তারের বাইশআঙুলে ছেলে (ছেলেটির প্রত্যেক হাতে ছয় ছয়টি আঙুল বলে অনেকেই তাকে 'বাইশ আঙুলে' বলে ডাকতো) এসে বললে, 'কাকা, বাবা আপনাকে ডাক্‌ছেন, একটা ভারি মজার ঘটনা হয়েছে।' ঘটনাটা হচ্ছে—একটি যুবক চুরি করেছিল সেজন্য তার বাঁ হাতটি কাটা হয়ে গেছে, আর সে এখন হাসপাতালে আছে। বটে! চুরির অপরাধে হাতকাটা! এ বড় তাজ্জব সাজা। তখুনি সে দৃশ্য দেখবার জন্যে ডাক্তারের বাড়ি চললাম। ডাক্তারের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে হাতকাটা ছেলেটির অবস্থা দেখে কিন্তু চোখে রুমাল দিয়ে ফিরে এলাম। ডাক্তার ভদ্রলোক বাড়ি ফিরে এসে এই যুবকের সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি কথা বললেন, তাই হলো আসলে আমার গল্প।

এই আফগান যুবকটির নাম 'আলী গুল', ডাক নাম হয়তো

অন্যকিছু আছে। সেটা সঠিক জেনে উঠতে পারিনি। কাজেই 'গুল' বলেই তার নামটা সোজা করে নেওয়া যাক। গুল হিন্দুস্থানে থাকত আর সেখানে সুদে টাকা খাটিয়ে যা দু'পয়সা রোজগার করত তাই নিয়ে তার বাবাকে দিত। বাবার কিন্তু তাতেও অভাব মিটতো না, লোকটা ছিল এমনি হতভাগা, কাজেই অভাবের তাড়নায় নানারকম কুকার্য করে সে অনেকবার জেলও খেটেছে এবং তার চুরি করার অভ্যাসটাও রয়ে গেছে। গুল হিন্দুস্থান থেকে টাকাপয়সা নিয়ে দেশে ফিরে যাবার পরেও গুলের বাবা এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে একখানা ইরাণী রুমাল চুরি করে এবং পুলিশ গুলের বাবার কাছে সেই রুমাল দেখতে পেয়ে তাকে আটক করে। গুল পুলিশকে নানারকম মিথ্যার দোহাই দিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠে নি।

গুল ভেবে দেখলে যখন তার বাবার এই অপকীর্তি চুরির খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন তার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। সে অগাধ টাকার মালিক। 'হিন্দুস্থান' থেকে সে এনেছে এত টাকা, হয়েছে বড়লোক—সত্যিইতো এ ভয়ানক অপমানের কথা! 'হিন্দুস্থানের' এক এক টাকা তাদের দেশের চার টাকার সমান। হিন্দুস্থানের টাকাকে আফগানরা 'কালদার' বলে থাকে। 'কালদার' শব্দটার মানে জাননাতো? খুব জমকালো মানে—অনেকটা আমরা যেমন বলি 'সাতরাজার ধন মাণিক'। তেমনি সাত রাজার সম্পত্তি এক করেই এক 'কালদার' হতো প্রাচীনকালের আফগানিস্থানে! প্রাচানকালের আফগানিদের নাকি সেই ধারণা থেকেই এ 'কালদার' কথাটা এসেছে। এই রকম অসংখ্য 'কালদাবে'র মালিক গুল—আর তার বাবা চোর। এ অপমান থেকে বাঁচবার উপায় কি ঠাওরাতে না পেরে শেষকালে গুল কাজির কাছে গিয়ে বললে সেই রুমাল চুরি করেছিল, তার বাবা সেই রুমালটিকে তাঁর ছেলের রুমাল মনে করে নিয়ে গিয়েছিল।

কাজি অমনি আদেশ দিলেন, যে হাতে সে চুরি করেছে, সেই হাতখানা কেটে ফেলতে হবে কাজির সাম্‌নেই। অমনি কাজির কথামতো ডান হাত কাটা হলো—গুল তার বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

তার বাবা যদি টের পেত যে অপরাধে তার ছেলের হাত কাটা যাবে তবে হয়তো সে নিজে স্বীকার করত তার অপরাধ, কিন্তু সে একথা টের পেলে না, যখন টের পেলে ছুটতে ছুটতে কাজির দরবারে হাজির হয়ে দেখে—ছেলের ডান হাত কাটা, ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়ছে।

গুল দেখলে তার বাবা এসেছে—সে ঐ যন্ত্রণার মধ্যে তার কাটা হাতখানাকে বাম হাতে তার বাবার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—'এই নাও তোমার পাপের ফল।' গুলের বাবার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, সে সেই মুহূর্তে পাগলের মত তার ছেলের কাটা হাতখানা নিয়ে কোথায় যে চলে গেল—কেউ তার খবর রাখলে না। গুলকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো তারপর। ডাক্তারের মুখে এই গল্প শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল সেদিন—জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'এ কি সত্যি!'

সত্যি! পাঠানরা অমনি শক্তিশালী জাতি! সেই গল্প মনে পড়লে আজও ভাবি যে, সামান্য একটা রুমাল চুরি করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যদি পাঠান যুবক একখানা হাত কেটে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করে—তা'হলে যারা সর্বহারার সর্বস্ব লুটেপুটে চুরি করে খায়—তাদের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে?

রক্ত উত্তাল ! ওপরে চল !!

গৌরকিশোর ঘোষ

সুকুমার চা খেয়ে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দিল। আজ সু-কভারও পরল সে। তারপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। আঙ শেরিং, আজীবা, টাসী আর নরবু প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীপ তখনও তাঁবুর ভিতরে। দুটো মোজা পরে বাঁ পায়ে জুতো গলাতে পরেছে না। পা কষে ধরছে। নানাভাবে চেষ্টা করল দিলীপ জুতোকে জুত করতে পারল না।

'দিলীপ, আয়।' সুকুমার ডাকল। 'দেরি করছিস কেন ?'

দিলীপ এবার অধৈর্য হয়ে উঠল। তারপর ধুত্তোর বলে নিতান্ত গোঁয়ারের মত এক কাজ করে বসল। একটানে একটা মোজা বাঁ পা থেকে খুলে ফেলল। তারপর একটা মোজা পরেই জুতোর মধ্যে বাঁ পা গলিয়ে দিল। সু-কভার বাঁধল। ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। ওরা আজ ক্র্যাম্পনও পরেছে।

বেশ সুন্দর আবহাওয়া। আকাশে একেবারে পরিষ্কার রোদ ফুটেছে। সুকুমারের মনটা খুশিতে নেচে উঠল। টাসী, আজীবা আর নরবু আগে বেরিয়ে গেল। আজ কারো কাছেই বিশেষ বোঝা নেই। প্রথম দলটা 'কল'-এর উপর উঠল, তারপর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

এবার সুকুমাররা যাত্রা করল। প্রথমে আঙ শেরিং, তারপর সুকুমার,

পিছনে দিলীপ। দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা 'কল'-এর উপরে পৌঁছে গেল। হাওয়া নেই। চলতে ফুর্তিই লাগছে। 'কল'-এর পশ্চিম দিকটা একেবারে ফাঁকা। ওদিকে যে-সব পাহাড় আছে, তাদের কারোরই চূড়া 'কল'-এর উপরে ওঠেনি। পাহাড়গুলোকে কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে। 'কল'-টা এত উঁচু যে, নিচুর দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। অনেক দূরে পাহাড়-পর্বতের ফাঁক দিয়ে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছে। ওদের মনে হল, কেউ যেন এক কাপ জল রেখে দিয়েছে।

দক্ষিণে নন্দাঘুন্টির গিরিশিরা। টাসী, আজীবা আর নরবুকে দেখা গেল। ওরা পাহাড়ের গায়ে গজাল পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি খাটিয়ে পথ বানিয়ে চলেছে। আজ শুরু থেকেই ওরা দড়ি বেঁধে চলেছে। এক দড়িতে টাসী, আজীবা আর নরবু, অন্য দড়িতে আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। দিলীপকে ছবি তুলতে হচ্ছে, তাই সে আছে সবার পিছে।

ওরা নন্দাঘুন্টির উত্তর গিরিশিরার পুব দিকের পথ ধরে উঠতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে প্রথম কুঁজটার নীচে এসে পৌঁছল। পথটা এত খাড়া, এক দিকে আবার অতলস্পর্শ খাদ যে, টাসীরা এ-পথে দড়ি খাটিয়ে অর্থাৎ 'ফিক্সড রোপ' করে গিয়েছে।

সুকুমারেরা নিজের নিজের দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সেই ফাঁসের সঙ্গে ক্যারাবিনা দিয়ে ফিক্সড রোপ যুক্ত করে দিলে। তারপর বাঁ হাতে ক্যারাবিনা ধরে ধীরে ধীরে সেই ভয়াবহ খাড়া কুঁজের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ওদের আন্দাজ সেই কুঁজটার উচ্চতা ৭০০ ফুট হবে। চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একেবারে সরাসরি উঠতে দম বেশী লাগে। তাই ওরা একটু এঁকেবেঁকে চলতে লাগল। চলার গতি ক্রমশঃই মন্থর হয়ে আসছে! হাঁফ ধরছে বেজায়। তৃষ্ণা পাচ্ছে। গলা বুক শুকিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে ওরা এই কুঁজটার উপরে উঠল। দেখল আজীবা, টাসী আর নরবুও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছে। ওরাও বসে পড়ল।

এই ৭০০ ফুট চড়াইটা উঠতে ওদের সময় লাগল পুরো আড়াই ঘণ্টা। অনেক বিশ্রাম নেবার পর ওরা তখন আবার উঠতে শুরু করল, তখন ধীরে ধীরে আকাশে মেঘ জমতে আরম্ভ হয়েছে। ওরা সেদিকে চাইল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। আরও ৪০০ ফুট উঠল। বেলা তখন বারোটা।

সামনে, দূরে বেথারতলির পিছন দিয়ে নন্দাদেবীর সূচীতীক্ষ্ণ শিখর একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে। নন্দাদেবীর মাথায় মেঘ জমছে। দিলীপ ফটো নিল। উত্তর দিকে রন্টি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রন্টি হিমবাহটাকে মনে হচ্ছে বরফের নদী। দুধের নদীও বলা যায়। পুব-দিকে এর আগে বিশেষ কিছু দেখা যায় নি। এবারে বিরাট এক ফাটল দেখা গেল। নিমাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, এমন জায়গাতে বিরাট বড় এক ফাটলের দেখা মিলবে। কী আশ্চর্য, তার কথা হুবহু মিলে গেল। দিলীপ থেমে থেমে ফটো তুলছে। আঙ শেরিং বারবার ওকে তাড়া লাগাচ্ছে। এত দেরি করলে পৌঁছতে পারা যাবে না।

আবার ওরা ভসভসে নরম বরফে এসে পড়ল। এতক্ষণ দুটো দড়ি আলাদা আলাদা যাচ্ছিল, এখান থেকে ওরা দুটো দড়ি একসঙ্গে জুড়ে নিল। এবার ওরা ছয়জনে একসঙ্গেই চলতে লাগল। প্রথমে যাচ্ছে টাসী, তারপর আজীবা, তারপর যথাক্রমে নরবু, আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। আজীবা, টাসীর পিছনে থাকলেও সে-ই প্রকৃতপক্ষে আজ পথ দেখাচ্ছে। আজীবার মত এত ভাল আর বুঝি কেউ বরফ চেনে না। আজীবার নির্দেশেই টাসী পথ বানিয়ে চলেছে।

ওরা আবার বিশ্রাম নিতে বসল। দিলীপ একাগ্রমনে ফটো তুলতে লাগল। সে নীচের দিকে চেয়ে ২নং শিবির দেখতে পেল না বটে, তবে আশেপাশের জায়গাগুলো চিনতে পারল।

আপন মনে ছবি তুলে যাচ্ছিল দিলীপ। অন্য সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় কানফাটানো প্রচণ্ড এক শব্দ শূন্য আকাশ

থেকে ওদের মাথায় ভেঙে পড়ল। দিলীপের পিলে চমকে গেল। হাত থেকে ক্যামেরা ছিট্‌কে গেল। ভাগ্যিস, ক্যামেরাটা গলায় ঝোলানো ছিল, না হলে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেত।

ধক্-ধক্ বুকে হাত চেপে দিলীপ নিজেকে সামলে নিল। তারপর আকাশের দিকে চাইল। ততক্ষণে অন্য সকলেও আকাশে চোখ তুলেছে। ওরা মুহূর্তের মধ্যে দেখল, ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানা জঙ্গী জেট বিমান ছোঁ মেরে ওদের দেখে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ পেল না। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া তার পিছনে কুটিল কালো মেঘের দল, তার পিছনে তীব্রগতি তুষার-ঝটিকা সবেগে আঘাত করল। এই তীব্র, হিংস্র, অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অভিযাত্রীরা কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার কথাও যেন ভুলে গেল সব।

অবশেষে সম্বিৎ ফিরে আসতেই সুকুমার নির্দেশ দিল, 'শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, বরফে মুখ গুঁজে শুয়ে পড় সব, জলদি।'

মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব না করে সকলে নেতার নির্দেশ পালন করল। তারপর পনেরো মিনিট ধরে চলল তুষার-ঝড়ের অবর্ণনীয় তাণ্ডব। সুকুমারের মনে হল, নরক বুঝি জেগে উঠেছে। নিস্তার পাওয়া শক্ত। তাপমাত্রা হু-হু করে নেমে যাচ্ছে। শরীরের অস্থিমজ্জায় শীত যেন ঢুকে পড়ছে। চোখে-মুখে তুষার-ঝড়ের হিংস্রতম ঝাপটা এসে লাগছে। মুখের গালের অনাবৃত অংশের চামড়া বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে!

পনেরো মিনিটের মধ্যেই হাওয়ার বেগ কমে এল। শুরু হল তুষারপাত। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। ২০৷২৫ ফুটের বেশী আর দৃষ্টি চলে না। ওরা আবার উঠে বসল। সুকুমার বোধ করল, তার পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে গ্রাহ্য করল না।

আঙ্গীবা আর আঙ শেরিং দুজনেই পোড়-খাওয়া শেরপা। ওদের

চোখে আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এল। আবহাওয়ার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। বাহাৎ খতরনাক হ্যায়। হিসেব করে দেখল এখনও ১৬০০ ফুট উঠতে হবে, তারপর ২৭০০ ফুট নামতে হবে—এই দুর্যোগে। সাব্‌রা নতুন লোক। যদি ফিরতে না পারে? তা হলে অবধারিত মৃত্যু। মৃত্যু যদি নাও হয়, বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। অতএব—

আঙ শেরিং পরামর্শ দিল, ফিরে যাওয়াই ভাল।

আজীবা পরামর্শ দিল, ফিরে চল সাব্। নরবু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। প্রৌঢ় শেরপা পেম্বা নরবু। সে বরাবরই চুপ করে থাকে। এতদিনের মধ্যে একটা কথাও তার মুখ থেকে কেউ শোনে নি। হঠাৎ সে মুখ খুলল।

বলল, 'শুনো সাব্, বাঙালকা ইজ্জৎ তুম্‌হারা হাত মে হ্যায়। উঠো, চলো উপর, আগু বাঢ়। বাঙালকা ইজ্জৎ বচানেকে লিয়ে হামলোগ জান দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়।'

সুকুমারের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। সে দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'উপরে চল।'

দিলীপের বুক ফেটে যাচ্ছে, সুকুমারের বুক ফেটে যাচ্ছে। আজীবা আঙ শেরিং, টাসী, এমন কি নরবুও কাহিল হয়ে পড়েছে। জল চাই এখন, এক ফোঁটা জল। না হলে দিলীপ বুঝি মরেই যাবো। অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। প্রায় আড়াইটা বাজে। দিলীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর একটা পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে। না, এবার একটু জল খাবে সে। দিলীপ চট্ করে জলের বোতল খুলে গলায় উপুড় করে ঢেলে দিল। কিন্তু এ কী, এক ফোঁটা জলও তার গলায় পড়ল না। অথচ বোতলের জল ভরতি। দিলীপ দেখল বোতলের জল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

আঙ শেরিং দেখল, দিলীপ ওর জলের বোতলটা উপুড় করে ধরে

বোকা-বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল ওর বোতলে বোধ হয় জল নেই। তাড়াতাড়ি নিজের বোতলটা এগিয়ে দিল। দিলীপ কালবিলম্ব না করে ছিপি খুলে বোতলটা গলায় উপুড় করে দিল। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এক ফোঁটা জলও গলায় পড়ল না। আগের মতই ভিতরের জল জমে শক্ত বরফ হয়ে গিয়েছে। বার বার একই বিড়ম্বনা। তবু দিলীপ বিরক্ত হল না, অতি দুঃখে হেসে ফেলল।

আঙ শেরিংকে বোতলটা ফেরত দিয়ে সে উঠতে শুরু করল। বেলা আড়াইটা। আকাশে এখনও মেঘ, তবে আগের মত হিংস্র কুটিল নয়। মাঝে মাঝে মেঘ ছিঁড়ে আকাশ বেরিয়ে পড়ছে। ওদের দৃষ্টির দূরত্বও বেড়ে যাচ্ছে। মাঝখানে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ১০।১৫ ফুট দূরে কি আছে, তাও তারা দেখতে পাচ্ছিল না। এখন অবস্থা একটু ভালর দিকে যাচ্ছে। ২০।২৫ ফুট পর্যন্ত ভালই দেখতে পাচ্ছে। তার বেশী না।

দুটো কুঁজ পার হয়ে আসার পর থেকে দিলীপের মনে হচ্ছে, চড়াইটা যেন আর তেমন খেয়ালিপনা করছে না। একইভাবে উঠে যাচ্ছে। এ তবুও ভাল। এ যেন চেনা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা। খামখেয়ালি শুরু করেছে বরফ। বরফ কখনও বেশ শক্ত। এমন শক্ত যে, ক্র্যাম্পনের কাঁটা বেঁধে না। ওরা যেই সেইমত, অর্থাৎ পায়ে চাপ দিয়ে দু-চার কদম এগিয়েছে, অমনি ভস্‌ভস্‌—অতর্কিত নরম বরফের মধ্যে জানু পর্যন্ত তলিয়ে গেল ওদের। মহা ঝামেলা।

ধীরে, অতিশয় মন্থর গতিতে ওরা উঠে চলেছে। সকাল সাড়ে আটটায় ৩নং শিবির থেকে বেরিয়েছিল। ছয় ঘণ্টা অবিরাম উঠেছে। উঠছে, তবু চূড়ার দেখা নেই। 'ফিক্সড রোপ' করতে করতে ওদের দড়ি ফুবিয়ে গেল, তবু রাস্তা ফুরোল না। কখনও কি ফুরোবে? ওরা কি পৌছতে পারবে নন্দাঘুন্টির শিখরে? সুকুমার যেন প্রশ্ন করল নিজেকেই।

মাঝে মাঝে এখনও হাওয়া বইছে। হাড়-কাঁপানো হাওয়া। সুকুমার বুঝতে পারছে ওর সহ্যশক্তি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রবল যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে সুকুমারের। কিন্তু কোথায়? দেহে না, মনে? পায়ের ফোসকায়, না ব্যর্থতার আশঙ্কায়, সুকুমারের শ্রান্ত ক্লান্ত চৈতন্য সেটা কিছুতেই ধরতে পারছে না। মনে মনে শুধু একটা কথাই আওড়ে চলেছে, ভেঙে পড়ো না সুকুমার, পথ এখনও বাকী আছে।

সুকুমার স্বেচ্ছায় আর চলছে না। এক অন্ধ শক্তি, একটা প্রবল ইচ্ছা, স্বয়ংক্রিয় এক তাড়না তাকে যেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভেঙে পড়ো না সুকুমার, ভেঙে পড়ো না, পথ এখনও বাকী। থেমো না সুকুমার। আগে চল।

কে আমি? আমি সুকুমার, সুকুমার রায়, খিদিরপুরের সুকুমার। এখানে কেন? পর্বত অভিযানে। কোথায় যেন একটা ব্যথা লাগছে? আমার শরীরে কি? আমার গায়ে? আমার পায়ে? নাকি হাতে? নাকি বুকে? ফুসফুসে? হৃৎপিণ্ডে? প্লীহায়, যকৃতে, অন্ত্রে? নাকি মনে? আত্মায়? নাকি জগৎ চরাচরে অথবা কোথাও না?

এ কী থামলাম কেন? আমি থেমে গেলাম নাকি? ওরাও যে থেমেছে। ওরা? হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ল সুকুমারের, ওর সঙ্গীরাও আছে। সে একা নয়। মনে পড়ল, সঙ্গে দিলীপ আছে। কোথায় দিলীপ? ঐ যে দড়ির শেষ প্রান্তে বাঁধা। দড়ির অগ্রভাগে কে? এতক্ষণ আজীবা ছিল। ঐ যে আজীবা, গুরুতর পরিশ্রমে কাতর আজীবা, দড়ি খুলে ফেলেছে। এবার এগিয়ে গেল কে? টাসী। ঐ যে, আজীবার জায়গায় নিজেকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে।

থেমো না সুকুমার, আগে চল। আবার চলা শুরু হল। আবার উঠতে লাগল ওরা। উঠছে, উঠছে, একজন পিছলে পড়ল, পিছনের লোক তাকে সামাল দিল। উঠছে উঠছে, একজনের পা ফসকাল, পিছনের লোক ধরে ফেলল। উঠছে, একটু একটু করে উঠছে। থেমো না, থেমো না, ওঠো।

টাসী উঠছিল সবার আগে। বহু অভিযানের পোড়-খাওয়া টাসী। দৈত্যের মত ক্ষমতার টাসী। সাতাশ বছরের জোয়ান টাসী। সকলের আগে আগে উঠছিল। চড়াইটা একটা সুষম ঢালুতে অবস্থান করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একটা বেপরোয়া লাফ দিয়ে খাড়াভাবে উঠে গেল। টাসী থমকে দাঁড়াল সেখানে। খাড়াই-এর উচ্চতা বেশী নয়। ফুট ছয়েক হবে। উপরে একটু কার্নিসের মত। গোদের উপর বিষ-ফোড়া। টাসী আজীবার মুখের দিকে চাইল। আজীবা পলকে তাব ইঙ্গিত বুঝে নিল। পা ঠুকে ঠুকে বরফের কঠিন ভিত্তি তৈরি করে দুটো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর শক্ত মুঠোয় দড়ি ধরে 'রিলে' করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। আজীবা চোখ ইশারায় টাসীকে ইঙ্গিত করল, আগু বাঢ়।

টাসী সেই বিপজ্জনক উচ্চতার অস্তিত্ব কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে অসাধারণ তৎপরতায় লাফ মেরে বরফের কার্নিস ধরে ঝুলতে লাগল। একটা মুহূর্ত মাত্র। টাসী তার আঙুলের জোর ফিরে পাবার আগেই তাকে কেউ যেন প্রবল ধাক্কায় ফেলে দিল। আজীবা এই মুহূর্তটির জন্যই যেন সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিল। চোখের পলকে সে দড়ির কেরামতিতে টাসীর টলমলে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করল। টাসী শিশুর মত হেসে উঠল, আজীবাও।

আজীবা আবার ইঙ্গিত করল, আগু বাঢ় টাসী। টাসী আবার এক লাফ মেরে সেই বরফের কার্নিসে ঝুলে পড়ল। কিন্তু সে বরফ এত নরম, এতই পলকা যে, এবার কার্নিসের খানিকটা অংশ ভেঙে টাসী মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আজীবা এবারও তাকে সামাল দিল। বার বার কয়েকবার টাসী লাফ দিয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল। বার বার সে ব্যর্থ হল। মাঝে মাঝে মেঘ ফাঁক করে আকাশ ওদের ব্যর্থতা দেখে নিয়েই আবার চকিতে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিল।

ওরা বুঝতে পারল, নন্দাঘুন্টির এইটেই হল শেষ প্রতিরোধ এবং

সে সহজে পথ দেবে না। আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা শুরু হল। তুষার বর্ষণও আরম্ভ হয়ে গেল। আবার ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হতে লাগল। যেটুকু আলোও এতক্ষণ ছিল, তাও কমে যেতে থাকল।

আজীবা দক্ষ সেনাপতির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, কোথায় নন্দাঘুন্টির দুর্বলতা, সে এবার টাসীকে একটু ডান দিকে সরে গিয়ে, সেখান থেকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিল। টাসী আজীবার নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক প্রবল লাফে কার্নিস ধরে ফেলল। তারপর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে শরীরটাকে একটা দোল খাঁইয়েই উপরে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কার্নিসের একটা বড় অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ভীষণ বেগে কোন্ অতলে অদৃশ্য হয়ে গেল! অজস্র তুষার কণিকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। টাসী তার আগেই বিদ্যুৎগতিতে একটা গড়া মেরে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছে।

এবার টাসী উপর থেকে দড়ি নামিয়ে দিল। আজীবা উঠল। তারপরে নরবু, তারপরে আঙ শেরিং, তারপর সুকুমার, দিলীপ। দিলীপের মুভি ক্যামেরা আঙ শেরিং-এর হাতে। দিলীপ হাত কামড়াতে লাগল।

চড়াইটার উপর একটা চাতাল। প্রায় ২০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট সমতল। গোটা দুই তাঁবু অনায়াসে টাঙানো যায়। পশ্চিম প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তার পরেই ওদের খেয়াল হল, আরে, আর তো ওঠার জায়গা নেই! এই তো চূড়া!

এই তবে চূড়া! চূড়া, চূড়া, নন্দঘুন্টির চূড়া!!! হা ঈশ্বর! যাক বাবা, বাঁচা গেল, আর উঠতে হবে না। সুকুমার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দিলীপের বুকের ভিতর প্রবল এক বিপ্লব, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ, যন্ত্রণা, সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছে। একটা আওয়াজ, প্রচণ্ডভাবে একটা চিৎকার করতে চাইছে দিলীপ। তাহলে

সে স্বস্তি পাবে। কিন্তু দিলীপের মুখ দিয়ে একটু সামান্য শব্দও বের হল না।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরেই শেরপারা ঝাঁপিয়ে পড়ল এ ওর বুকে। কোলাকুলির পর কোলাকুলি। কে যে কার সঙ্গে কতবার কোলাকুলি করল, তার হিসেব রাখল না কেউ। এমনি করে আবেগের উত্তাল ঢেউগুলো ধীরে ধীরে কিছুটা শান্ত হয়ে এল। এরই ফাঁকে দিলীপ ঘড়ি দেখে নিয়েছে—৩-৫ মিঃ। এরই মধ্যে দিলীপ অলটিমিটার দেখে নিয়েছে—২০৮০০ ফুট। ২০৮০০? ওদের অলটিমিটারে তাই বলল। তবে যে সে পড়েছিল নন্দাঘুন্টির উচ্চতা ২০৭০০ ফুট। যাকগে, নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

দিলীপ কালবিলম্ব না করে ছবি তুলতে শুরু করল। শেরপারা ততক্ষণে নিয়মরীতি পালন করতে লেগেছে। জাতীয় পতাকাটি সুকুমার নিজের তুষার গাঁইতিতে বেঁধে পুঁতে দিল চূড়ায়। কলকাতা থেকে কারা যেন নারকেল সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো ভেঙে তার জল ঢালতে গিয়ে দেখা গেল, সেই জলও বরফ হয়ে গিয়েছে। দিলীপ আশা করেছিল, নারকেলের জল খেয়ে তেষ্টা মেটাবে। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অভাগা যেদিকে চায় সাগরও জমিয়া যায়।

সে ক্ষুণ্ণমনে রোলিকর্ড ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডার খুলে ছবি নিরীখ করতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভিউ-ফাইণ্ডারটি বরফের গুঁড়োয় ভরতি হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে সে আন্দাজে সেরেফ চোখের নিরীখেই ছবি তুলে গেল।

ওরা এক বাণ্ডিল দড়ি ওখানে গোল করে পুঁতে দিল, তার মধ্যে একখানা জাতীয় পতাকা পেতে তার উপর সকলের নাম লেখা-কাগজখানা রেখে তার উপর পিটন চাপা দিয়ে রেখে দিল।

তারপর, ওরা নামতে শুরু করল।

দিলীপ ঘড়ি দেখল। বেলা তখন ৩-৪০ মিঃ। আরোহণ যতটা

কষ্টসাধ্য, অবতরণও প্রায় তাই। ওরা ওঠবার সময় যে রাস্তা বানিয়ে রেখে গিয়েছিল, নতুন বরফ তা ঢেকে দিয়েছে। আবার নতুন করে পথ বানাতে হল। ফলে গতি শ্লথ হয়ে এল। ওরা যে সময় বড় কুঁজটার উপর এসে পৌঁছল, তখন গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গিয়েছে। কিছু দেখবার উপায় নেই। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছে সেই বিপজ্জনক ৭০০ ফুটের খাড়া উৎরাই। বিপদের উপর বিপদ, ওরা যে 'ফিক্সড্ রোপ' করে গিয়েছিল, বরফ পড়ায় তার চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। আঙ শিরিং এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল। সে বললে, এই অন্ধকারে, এই নিদারুণ বিপজ্জনক পথে নামা ঠিক হবে না। এসো আমরা এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই। কাল সকালে নামব। নরবু বলল, আমাদের সঙ্গে তাঁবু নেই, সাব্‌দের যা পোশাক, তাতে রাত্রে এখানে থাকলে পাষাণ হয়ে যাব! মৃত্যু অবধারিত। নামবার সময়ও মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয়, এখানে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করার চাইতে নামবার চেষ্টা করাই উচিত। তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাও ভাল।

নরবুর কথাতে সকলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। খোঁজাখুঁজি করতে করতে 'ফিক্সড রোপ' পাওয়া গেল। তারপরে শুরু হল এক দুঃসাহসিক অবতরণ। টাসী আগে আগে নামছে। তার হাতে দড়ি, মুখে টর্চবাতি। সে কয়েক ধাপ নেমে একে একে পিছনের লোকেদের নামতে সাহায্য করছে। সুকুমার দেখল, একটা টর্চের আলো তাদের পথ দেখিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। হাওয়া নেই, দুর্যোগের চিহ্নমাত্রও নেই। আছে শুধু শীত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আর আকাশে অজস্র তারা।

দিলীপের অদ্ভুত লাগছিল। কি নিস্তব্ধতা! এই জমাট অন্ধকার রাত্রির মতই ঘন সেই নৈঃশব্দ্য। ওর কানে কেউ ভারী সীসে ঢেলে দিয়েছে। আর এই উজ্জ্বল তারাগুলো কত নীচে ঝুলে আছে। ও

যেন ইচ্ছে করলেই একটা তারা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলতে পারে।

আরে, ও কী! দিলীপ চমকে উঠল। ওর দড়িতে ঝাঁকুনি লাগল। একটা টর্চের আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ সেটা অতি দ্রুত খাদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সর্বনাশ! সেই শীতেও দিলীপের গায়ে ঘাম দেখা ছিল। টাসী পড়ে গিয়েছে।

'ফিক্সড্ রোপ' ধরে নেমে যাচ্ছিল টাসী। হঠাৎ গোটা কয়েক পিটন উপড়ে গেল। নিমেষের মধ্যে সে ২৫।৩০ ফুট নীচে সোঁ করে তলিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, সে দড়ি ছাড়েনি। তাই বেঁচে গেল। ওকে তুলে আনা হল। পিটনগুলো আবার পোঁতা হল ভাল করে। তারপর অতি সাবধানে নামতে নামতে, রাত্রি সাড়ে-নটার সময় ৩নং শিবিরে পৌঁছে গেল। তের ঘণ্টার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সবাই তখন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে খানিকটা স্যুরুয়া গরম করে নিয়ে কোনমতে গিলে ফেলল। তারপরে তলহীন নিদ্রার সুগভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল সবাই।

নতুন পল্লীর ডাক্তার

সতীকুমার নাগ

বিন্নু ইস্কুল থেকে ফিরে আসে। ইস্কুলের বইগুলো টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে। তারপর, হাত-পা, মুখ-চোখ ভালো করে ধোয়। তার বিকেলের খাবার এক বাটি দুধ।

বিন্নু দুধের বাটি দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা, আমি এ দুধ খাবো না, খাবো না!'

'কেন রে? কি হয়েছে?' মা তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন, পাশের ঘর থেকে।

'এই দেখ না! [illegible]টির চারদিকে কত নোংরা।'

মা দেখলেন—তাই তো!

মেয়ের বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখে মা মনে মনে ভারী খুশী হন।

এদিকে কি হয়েছে তাই বলি!

ছোড়দা খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসেছে। দু'বন্ধু ছোড়দাকে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে এসেছে।

মা জিগ্যেস করেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে, 'কি হয়েছে?'

ছোড়দা কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, 'বল খেলতে গিয়ে'---

'ও মা!' ভয় পেয়ে মা আঁতকে ওঠেন। কি করবেন না করবেন—কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

বিন্নু বললো, 'মা বরফ এনে ছোড়দার পায়ে দাও। দেখো, ফুলো,

ব্যথা এক্ষুনি সেরে যাবে। ছোড়দার সামনে ও-রকম করবে না। ওতে ছোড়দা আরো ভয় পাবে।'

মা তখনই বরফ আনতে পাঠালেন।

রামু চাকর বরফ কিনে ফিরে এলো। বরফের টুকরো ছোড়দার পায়ে কিছুক্ষণ দেওয়া হলো।

সত্যি, খানিক পরে দেখা গেল, ফুলো কমে আসছে, পায়ের ব্যথাও তেমন নেই। ছোড়দা বললো, 'অনেক কমে গেছে, মা।'

'সত্যি, বরফের কথা আমার মনেই ছিল না।' মা বললেন।

বিনু বললো, 'জানো মা, আজ দিদিমণি বলে দিয়েছিলেন, পায়ে চোট লাগলে বরফ দিতে।'

ও-ঘর থেকে পিংকি কেঁদে ওঠে। 'দেখ তো বিনু পিংকির আবার কি হলো?' মা বললেন।

বিনু ছুটে গেল। 'পিংকি কি হয়েছে রে? কি করে আঙুলে লাগলো? দেখি রক্ত পড়ছে। ব্লেড দিয়ে পেনসিল কাটতে কে বলেছিলো?'

মাও এসে হাজির হলেন। রক্ত দেখে মা আঁতকে উঠলেন।

'দেখেছো, কি রক্ত! উঃ, কি করে হলো?'

'মা, অমনি করলে পিংকি ভয় পাবে। ওঃ, কিছু নয়। দেখ না, এখনি সেরে যাবে।' এই বলে বিনু খানিকটা জলে এক টুকরো নেকড়া ভিজিয়ে নেয়। ঐ ভিজে নেকড়া ওর কাটা নখের আঙুলে জড়িয়ে দেয়। সত্যি রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

মা বিনুর বুদ্ধি দেখে প্রশংসা করেন।

'মা, বিপদে পড়ে কখনো ঘাবড়াতে নেই। আচ্ছা মা, বলতো, আগুনে হাত পুড়ে গেলে কি করবে?'

'তুই বল না, শুনি।'—হাসতে হাসতে মা বললেন।

'বাতাস করতে নেই, এমন কি সেখানে জলও দিতে নেই। বাড়ীতে নারকেল তেল থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তা দিলে ভালো হয়। ঘরে যদি

স্পিরিট থাকে, তা ঢেলে দিলেও চলে। পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

মা শুনে বললেন, 'ঠিক বলেছিস, বিনু।'

এমনি সময় মণ্টু কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হয়।

'কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে তোর?'

'মা, টুনোদা এই দেখ না!' বলে নিজের কানটা দেখায়।

'সত্যি, দেখেছো, মণ্টুর কানের পাতা কেমন লাল হয়ে উঠেছে।'

বিনু টুনোর কাছে গিয়ে বলে, 'টুনো, তুমি মারলে কেন?'

'মারবে না তো কি করবে? দেখ না, আমার পেনসিল নিয়েছে।'

'তা বলে ওকে কানে মারবে?—জানো, কানের পরদা কত পাতলা, কানের আঘাতে কত কিছু বিপদ ঘটতে পারে।' বিনু টুনোকে বকে।

মণ্টুকে আদর করে। বিনু মাকে বলে, 'জানো মা, কানের পরদা ছিঁড়ে গেলে কালা হয়ে যাবে। আর শুনতে পাবে না।'

মণ্টুও তেমনি কাঁদ-কাঁদ সুরে বলে, 'বড্ডো ব্যথা করছে মা।'

'ওর কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে!' মা টুনোকে বকেন, আর বিনুকে হাসি মুখে বলেন, 'তোর বুদ্ধিশুদ্ধি দেখে খুশী হয়েছি।'

'মা, আমি বড় হয়ে ডাক্তারী পড়বো। বড় ডাক্তার হবো।' বিনু বলে।

'বেশ তো! তোকে ডাক্তারীই পড়াবো।' মার কথা শুনে বিনু ভারী খুশী হয়। আনন্দে হাতে তালি দিয়ে বিনু বলে ওঠে, 'কি মজা হবে রে—কত ছেলেমেয়েকে ভালো করবো!'

বিনুর মনে কত আশা।

সে বড় হবে। তাকে হতে হবে ডাক্তার।

'সেবা পরম ধর্ম' এই কথা সে জেনেছে। তাই বিনু নিজেকে এক নতুন জগতে নিয়ে এলো।

বিনু মন দিয়ে পড়াশুনা করে।

তার নিজের চেষ্টায় ও আন্তরিকতায় সে সত্যি সত্যি একদিন বড়

হয়ে উঠল।

বিমু এখন বড় হয়েছে। ডাক্তারী পাশ করেছে সে।

বিমু এখন নতুন কোম্পানীর ডাক্তার। কত ছেলেমেয়ে তার কাছে আসে।

সবাই আসে রোগ সারাতে। কেউ-বা আসে দাঁত দেখাতে। দাঁতে তাদের পোকায় ধরেছে।

আবার কেউ-বা আসে চোখের রোগ সারাতে। এমনি ধরনের কত রকমের রোগ আছে যাতে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা ভোগে। যাদেব মা-বাবার পয়সা নেই, তাদের কাছ থেকে বিমু কোন পয়সা নেয় না।

বিনা পয়সায় সে তাদের রোগ দেখে। এমন কি, নিজের পয়সা দিয়ে বিমু তাদের খাবারও কিনে দেয়।

তার দেওয়া ওষুধে সবাই ভালো হয়ে যায়।

নতুন পল্লীর মানুষেরা বিমুকে ভালোবাসে। এখন নামকরা ডাক্তাব সে। সবাই তাকে চেনে।

সেদিন আমাদের ভারত সরকার থেকে সংবাদ এসেছে, বিমু বিদেশ যাচ্ছে পড়াশুনা করতে। হ্যাঁ, ডাক্তারী পড়তে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা কেন রোগে ভোগে, তাদেরই কথা জানতে।

বিমু এখন নতুন পল্লী থেকে বিলেত গিয়েছে। মন দিয়ে সেখানে পড়াশুনা করছে। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিমু নাম করেছে বেশী। আসছে মাসে তার পরীক্ষা। পরীক্ষা হয়ে গেলেই সে দেশে ফিববে।

দেশে ফিরে এসে সে হয়ে উঠবে নতুন যুগের নতুন মানুষ।

শিক্ষায়-দীক্ষায় বিমু হয়ে উঠল এক আদর্শবান পুরুষ।

পরীক্ষাতে সে জয়ী হল। এবার তাকে ফিরতে হবে।

সবাব আগে বিমু যাবে নতুন পল্লীতে। সেখানকার ছেলেমেয়েদের আগে দেখবে—দাঁত, নখ, চুল, চোখ, কান।

———

ঘুমন্ত-পুরীর রাজকন্যা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মিনুর মামামণি আজ সন্ধ্যাবেলা কোথা থেকে অনেকগুলো কেয়াফুল কিনে এনেছেন। বায়না করে তার ভিতর থেকে একটা মিনু চেয়ে নিয়ে তার ঘরে এনে রেখেছে।

কাঁটা-দেওয়া লম্বা-লম্বা পাতার আড়ালে নরম সাদা ফুলটি যেন লাজুক একটি সুন্দরী মেয়ে। আর, কী মিষ্টি তার গন্ধ! সমস্ত ঘর যেন ঢুলে পড়েছে সেই নেশায়।

বাইরে ঝিম-ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের বাতি নেবানো। একলা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মিনুর কী ভালই লাগছে। কেয়াফুলের গন্ধ নয়, যেন ভারি মিষ্টি কার আদর। সমস্ত মন জুড়িয়ে যায়।

কেয়াফুলটা পাশের টেবিলের উপর ফুলদানিতে মিনু রেখেছে। ঘরের ভিতর বাতি নেভানো, কিন্তু জানলা-দরজা দিয়ে একটু-আধটু আলো চুইয়ে যে না এসেছে তা নয়। অস্পষ্টভাবে ফুলদানিটা দেখা যাচ্ছে। টেবিলের উপর ফুলটি যেন সাদার একটা আবছা ছোপ অন্ধকারে।

বাইরের রিম্-ঝিম্ বৃষ্টির আওয়াজে, আর ঘরের ভিতর কেয়ার মিষ্টি গন্ধে মিনুর চোখ ঘুমে ক্রমশ জড়িয়ে আসছিল; হঠাৎ ঠুক্ করে একটা আওয়াজে তার ঘোর কেটে গেল।

মিনু একটু অবাক হয়ে উঠল বসল; বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও হচ্ছে একটু। দমকা হাওয়ায় জানলার একটা পাল্লা গেছে খুলে। হয়ত তারই শব্দ।

মিনু আবার চোখ বুজোতে যাবে—হঠাৎ টেবিলের পাশে স্পষ্ট কার মিষ্টি গলা শোনা গেল। তাই তো! ভারি আশ্চর্য তো! কেয়া-ফুলটির ভিতর থেকেই যেন কার কথা শোনা যাচ্ছে!

'শুনছ!'

মিনু প্রথমটা বিশ্বাস করতেই চাইল না; কেয়াফুল আবার কথা কয় নাকি! কিন্তু আবার যখন মিঠে গলার মিনতি শোনা গেল, 'শুনছ!' তখন সে বলে ফেলল আপনা থেকেই 'কী?'

'আমায় একটু জানলার ধারে রাখবে!'

'কেন বল তো?' মিনু জিজ্ঞেস করলে অবাক হয়ে।

'এখান থেকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না।'

'দেখতে পাচ্ছ না! জানলার ধারে কী দেখবে?'

'বিদ্যুৎকুমারকে।'

মিনু একটু অবাক হল বৈকি! বিদ্যুৎই তো সে জানে, বিদ্যুৎ-কুমার আবার কী! কে জানে, হয়ত ভুলই শুনেছে, কিংবা কেয়া-ফুলেরা হয়ত বিদ্যুতের ঐ রকমই বানান করে! কিন্তু কেয়াফুলের অনুরোধটা তো রাখা দরকার।

মিনু ফুলদানিটা ধরে জানলার ধারে বসিয়ে দিলে, তারপর বললে, 'পড়ে যাও যদি!'

'না, পড়ব না। এই তলোয়ারের ফলাগুলো যদি একটু ফাঁক করে দাও, আমি বেরুতে পারি।'

নাঃ, ক্রমশ যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে! মিনু অবাক হয়ে বললে—'তলোয়ার কোথায়? পাতা বল!'

'না-না, পাতা হবে কেন, তলোয়ার! একটা রাজপুত্রের, একটা মন্ত্রীপুত্রের, একটা কোটালপুত্রের, একটা সদাগরপুত্রের।'

'সে আবার কী!' জিজ্ঞেস করলে মিনু, 'তলোয়ার কোথা থেকে এল ?'

'বা-রে, আমায় পাহারা দিতে তারা তলোয়ার পুঁতে রেখে গেছে, জান না!'

'না তো!'

'সে অনেক কথা!'

'বল না লক্ষ্মীটি!' মিনু অনুরোধ জানায়।

'শুনবে তাহলে!'

মিনুকে কি আর দু-বার বলতে হয়? সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে কেয়াফুলের পাতা—থুড়ি, তলোয়ারগুলি সরিয়ে ধরল।

ওমা! সত্যিই যে পালকের চেয়ে হালকা, ধোঁয়ার মত মিহি, রেশমের চেয়ে নরম, দুধের মত সাদা ওড়নায় ঢাকা, জোছনার মত সুন্দর একটি ছোট্ট মেয়ে বেরিয়ে এসে জানলার ধারে পা ঝুলিয়ে বসল!

মিনু অবাক হয়ে বললে, 'তুমিই ছিলে ঐ কেয়াফুলের ভিতরে?'

'হ্যাঁ, আমিই ছিলাম ঐ কেয়াফুল হয়ে, কত বছর—কত যুগ—তুমি ভাবতেই পার না।'

'কেন, কেন?'

'সেই গল্পই তো তোমায় বলছি। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির দেশ জান?'

'জানি না, তবে রূপকথায় যেন পড়েছি।'

'তোমরা আজকাল কি-ই বা জান!'

'বাঃ, আমাদের ভূগোলে কত-সব অদ্ভুত দেশের কথা আছে! বেচুয়ানাল্যাণ্ড, আলাস্কা, ক্যামাস্‌কাট্‌কা!'

'ও-সব নয়! ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর দেশ কোথায়, বলতে পার?'

'ও-সব আমাদের ভূগোলে নেই।'

'তোমাদের ভূগোলে কিচ্ছু নেই!'

অন্য সময় হলে মিনু এত সহজে ভূগোলের অপমানটা হজম করত না, কিন্তু এখন তর্ক করলে গল্প-শোনাটা যদি ফস্কে যায়, এই ভয়ে সে চুপ করে রইল।

কেয়াফুল বললে, 'সেই ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর দেশের শেষে ঘুমন্ত-পুরী।'

'ঘুমন্ত-পুরী জানি! যেখানে সবাই ঘুমিয়ে আছে; রাস্তায় লোকজন, রাজবাড়ীর দরজায় সেপাই-শান্ত্রী, দরবারে পাত্র-মিত্র, কোটাল, মন্ত্রী রাজা; আর জলের মত পরিষ্কার স্ফটিকের ঘরে নরম বিছানার উপর ঘুমিয়ে আছে অফোটা পদ্মের মত অপরূপ রাজ-কুমারী! তার পাশে সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি পড়ে রয়েছে। রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় সে ঘুমিয়েছে, সোনার কাঠি ছোঁয়ালে সে জাগবে; কিন্তু কে ছোঁয়াবে সোনার কাঠি! ঘুমন্ত-পুরী পাহারা দেয় অগুন্‌তি রাক্ষুসী, তারা দিনে চরে বেড়ায় দেশ-বিদেশে, সন্ধে হলেই কোথা থেকে দলে-দলে এসে হয় হাজির। মানুষ তাদের চোখে দেখতে হয় না, নাকে শুঁকেই টের পায়।'

মিনু হাঁপিয়ে উঠে একটু থামল।

কেয়াফুলের মেয়ে একটু ভারি গলায় বললে, 'তাহলে তো তুমিই সব জান, আমি আবার কী বলব!'

মিনু বুঝল, ভারি ভুল হয়ে গেছে, গল্প বলতে-বলতে মাঝখানে ফোড়ন দিলে ঠাকুমাও তো চটে যায়। কেয়াফুলের মেয়ে যে অভিমান করবে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে!

সে খুব অপরাধীর মত বললে, 'না ভাই, আমি আর কী জানি! তোমার কাছেই তো শুনতে চাইছি।'

কেয়াফুলের মেয়ের মনটা হাজার হলেও নরম, এইটুকুতেই গলে গিয়ে সে বললে, না-না, তুমি তো অনেকটা ঠিকই বলেছ, তবে তোমরা তো সব জান না, আমাদের দেশের ভুল খবর তোমাদের দেশে কারা সব রটিয়েছে, কে জানে।'

উৎসাহভরে মিনু সায় দিয়ে বললে, 'তা হতে পারে। বাবা বলেন,

'খবরের কাগজেই রোজ কত ভুল খবর বেরোয়, যত্নর ধড়ে রামের মাথা বসিয়ে তারা রামযত্ন তৈরী করে।'

কেয়া বললে, 'তবে! তোমাদের নিজেদের খবরেই যদি এত ভুল, তাহলে আমাদের কথা তোমরা আর ঠিক কি করে জানবে? ঘুমন্ত-পুরীতে কোথা থেকে এল এত ঘুম তা জান?'

মিন্নু যা জানত, তা বললে হয়ত আবার কেয়া রাগ করবে। তাই সে সাবধান হয়ে বললে, 'না তো!'

'ঘুমন্ত-পুরীতে একলা কে জাগে, তাও জান না?'

মিন্নু অবাক হয়ে বললে, 'কই না তো!'

'একলা জাগে রাজকন্যা নিজে। পুরীর মানুষ ঘুমে অসাড়, পুরীর পাথর ঘুমে নিঝুম, শুধু ঘুম নেই রাজকন্যার এক চোখে!'

'এক চোখে! সে আবার কী?'

'সেই তো গল্প।'

'একদিন রাজপুরী ছিল জমজমাট। পথে-পথে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ঘরে-ঘরে লোক থই-থই, রাজপুরী গম্-গম্ করে রাতদিন। হঠাৎ একদিন রাজকন্যা বাগানে গিয়ে 'না জানি' ফুলের 'দো-দানি' পাতা ছিঁড়ে বসল।'

'তাতে কী?'

'বলছি তো, শোনই না।'

'না-জানি ফুলের দো দানি পাতা তো শুনিনি কখনো?' বলে ফেলেই মিন্নু বুঝল, কাজটা ভাল হয় নি। কেয়া-মেয়ের ঠোঁট তখনই ফুলেছে।

'অত খিচ-খিচ করলে গল্প বলা যায় না।'

মিন্নু তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললে, 'না-না, এইবারটি মাপ কর, আর বলব না।'

কেয়া অবশ্য তখ্‌খুনি খুশি হয়ে বললে, 'পাতা তো নয়, জোছনা রাতের দুই পরী দিনের বেলা গলা-জড়াজড়ি করে পাতা হয়ে ঘুমিয়ে

ছিল। ছিঁড়ে তারা মাটিতে পড়ল, মাটিতে পড়ে শামুক হল, শামুক হয়ে শাপ দিলে—'

'শামুক হল কেন?'

'বাঃ, দিনের বেলায় কেউ ছুঁয়ে দিলেই ভাঙা চাঁদ পুরন্ত না-হওয়া অবধি পরীদের যে শামুক হয়ে কাটাতে হয়। কোথায় চাঁদের আলোয় হালকা পাখায় উড়ে বেড়াবে মনের খুশিতে, না শামুক হয়ে মাটির ওপর গুটি-গুটি নড়তে হবে। পরীদের রাগ তো হবেই।

তারা শাপ দিলে—

এক ছিলাম, তুই করলি,
দিনে ছুঁয়ে ঘুম ভাঙালি,
দু-চোখের পাতা তোর
এক হবে না।

রাজকন্যা কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে ফিরল। শাপের কথা শুনে রানী কাঁদেন, রাজা কাঁদেন, রাজ্যশুদ্ধ লোক কাঁদে। রাজকন্যার চোখে আর ঘুম নেই।

দিন যায়, হপ্তা যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, রাজকন্যা দু-চোখের পাতা আর এক করতে পারে না। রাজা বৈদ্য ডাকলেন, রোজা ডাকলেন, কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগ-যজ্ঞ করলেন—রাজকন্যার চোখে আর ঘুম আসে না।

শেষে রাজা দেশ-বিদেশে ঢ্যাঁড়া দিলেন—রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে পারলে মস্ত বখশিস। বখশিস। বখশিসের বহর বেড়ে চলল। মোহরের থলির বদলে মণিমুক্তো, মণিমুক্তোর জায়গাটা হীরে-মানিক; কিন্তু কেউ রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে পারলে না।

কত গুনিন এল, ওঝা এল, নামের-চেয়ে-উপাধি-বড় বৈদ্য এল, রাজকন্যার হায়রানিই সার। কেউ সারা দিনরাত মন্ত্র পড়ে, কেউ হরেক-রকম জড়িবুটি খাওয়ায়, রাজকন্যা তবু ঘুমের উপোসী। দিনে-দিনে রাজকন্যা শুকিয়ে কাঠটি হয়ে গেল।

রানীর চোখের জল আর শুকোয় না, রাজা ভেবে সারা। বলে
অর্ধেক রাজত্ব দেব, মেয়ে যদি ঘুমোয়। এমন সময় রাজপুরী
টিকারায় ঘা!

কে আসে? কে আসে? না—নিশুত-নগরের মস্ত গুনিন আসে
কিন্তু বড় বেশি তার খাঁই। অর্ধেক রাজত্বে তার কাজ নেই, ঘুম পাড়ি
স্বয়ং রাজকন্যাকে সে চায়। তাও বড় সহজ শর্তে নয়!—নিশুতি রা
একলা আসবে রাজকন্যার ঘরে, একলা জাগবে। চোখে যদি কেউ চে
দেখে, তাহলে আজীবন তার অ-নিদ কাটবে, আর সমস্ত পুরীর ঘুম যুগ
যুগান্তরেও ভাঙবে না।

রাজা অনেক ভাবলেন অনেক চিন্তা করলেন; কিন্তু উপায় তে
আর নেই—রাজি তাঁকে হতেই হল।

নিশুতি রাতে রাজপুরীতে টুঁ শব্দটিও নেই। সবাই আছে যে-যা
ঘরে চোখ বুজে। দেউড়িতে পায়ের আওয়াজ, পায়ের-আওয়াজ স্ফটিকে
সিঁড়িতে। রাজকন্যার বুক কাঁপছে পালঙ্কে শুয়ে। পায়ের আওয়া
ঘরের কাছে। পালঙ্কের কাছে খস্‌খস্‌, কোঁস্‌ কোঁস—কার বুঝি ভা
নিশ্বাসের শব্দ।

—রাজকন্যা, চোখ যেন খুলো না।

না, রাজকন্যা চোখ কিছুতেই খুলবে না। ঘরে কিসের ঠাণ্ডা-মি
গন্ধ, গন্ধ নয় বুঝি ঘুমেরই ঘোর,—নিশ্বাসে ঝিমিয়ে আসে গা, ঘুমে
সাগর উথলে উঠছে, ঢেউ ভেঙে পড়ে পায়ের কাছে, ঢেউ এল হাঁটু
উপর, ঢেউ গেল কোমর ছাড়িয়ে, হিমের মত ঠাণ্ডা ঢেউ গলার কা
খেলা করে, রাজকন্যার সকল দেহ এলিয়ে পড়েছে। হিমেল ঘুমের ঢে
এগিয়ে আসে।

—রাজকন্যা, চোখ খুলো না!

কিন্তু রাজকন্যা আর কি পারে। দুটি চোখ ঘুমে এসেছে জড়িয়ে
কার সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে—একবার না দেখে যে থাকা যায় না!

রাজকন্যা একটি চোখ বুজে-একটি চোখ খুলে তাকালে। সঙ্গে-স

কের রক্ত হিম! রাজকন্যা আঁতকে উঠে চীৎকার করলে।

আঁতকে উঠল কি সাধে! মেঝেয় কুণ্ডলি পাকিয়ে ছাদ পর্যন্ত বিরাট ফণা তুলে অজগরের রাজা নাগেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখাচোখি এক পলক শুধু, হঠাৎ ঘরের বাতি নিভল, জানলা-দরজা আছাড় খেল ঝড়ের দাপটে।

অন্ধকারে শোনা গেল শুধু দারুণ স্বর—

যে চোখে দেখেছ, সে চোখে জাগবে
নিঝুম-পুরীর ঘুম না ভাঙবে।

রাজকন্যা কেঁদে ফেলে বললে—আর কি তবে উদ্ধার নেই?

অট্টহাসির সঙ্গে শোনা গেল—আছে, যদি আমার রানী হও খন।

রাজকন্যা শিউরে উঠে বললে—না-না? সে হয় না!

—তবে যেমন আছ, তেমনি থাক. যতদিন না—

জলের তলায় আগুন জ্বলে,
সে আগুনে শিলা গলে।

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি শোনা গেল। সেই থেকে রাজকন্যা একচোখে জেগে কাটায়, রাজপুরীর ঘুম আর ভাঙে না।

রাজকন্যা জানে, উদ্ধার আর নেই। জলের তলায় আবার আগুন কেউ জ্বালাতে পারে নাকি! আর পারলেও এ ঘুমন্ত পুরীতে আসছে কে!

মাস যায়, বছর যায়, ঘুমন্ত-পুরী জড়িয়ে ওঠে কাঁটা-লতার জঙ্গল। ভয়ে সেখানে কেউ ঘেঁষে না।'

মিনু এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে গল্প শুনেছে, এইবার উৎসুক হয়ে বললে, 'কেন, রাজপুত্র কোথায় গেল?'

কেয়াফুল একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কোথায় আর যাবে! রাজপুত্র সবে পথে বেরিয়েছে,—দুয়োরানীর ছেলে বলে সুয়োরানী

রাতদিন দূর-দূর করেন, রাজা চোখে দেখেও কিছু করতে পারেন না। মনের দুঃখে রাজপুত্র ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে নিশুতি রাতে যেদিকে দু-চক্ষু যায় বেরিয়ে পড়েছে। দু-চক্ষু আর কোথায় যায়! পুরীর বাইরে মশান; রাজপুত্র সেইদিকেই চলেছে। মশানের মাঝে পথ আগলে কোটালপুত্র দাঁড়িয়ে—

—কোথায় যাবে বন্ধু?

—যেদিকে দু-চক্ষু যায়।

—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

রাজপুত্রের কোন মানা না শুনে কোটালপুত্র সঙ্গে চলে। মশান ছাড়িয়ে শ্মশান, সেখানে আর দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে. মন্ত্রীপুত্র আর সদাগরপুত্র, কোন মানা তারা শুনল না। রাজপুত্রের সঙ্গে তারা দেশান্তরী হবেই।

শ্মশানে দাঁড়িয়ে চিতার আগুন সাক্ষী করে চার বন্ধু প্রতিজ্ঞা করলে —জীবনে-মরণে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

তারপর চার বন্ধু কত দেশ, কত বন, কত পাহাড় ডিঙিয়ে চলে, পিছনে ফিরে আর তাকায় না। শেষে একদিন ঘুরতে ঘুরতে—

মিনু বলে ফেললে, 'ঘুমন্ত-পুরী!'

কেয়া তাড়াতাড়ি বললে, 'কী করে বুঝলে? আমি তো বলিনি!'

মিনু গম্ভীর হয়ে বললে, 'ও-সব আমি বুঝতে পারি।'

কেয়াফুল বোধহয় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে খানিক চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলে, 'ঘুমন্ত-পুরীর সে কী হাল! তার দেওয়াল টলোমলো, পড়ে পড়ে; তার ঘর-দোর জঙ্গল ঝোপে-ঝাড়ে।

তবু রাজপুত্রের কেমন শখ—ভিতরে যাবে। বন্ধুরা মানা করে, রাজপুত্রেও সেই এক গোঁ। কী আর করে, চার বন্ধু মিলে তলোয়ারে জঙ্গল সাফ করতে-করতে ভিতরে ঢুকল। যেদিকে চায়, জানলা-দরজা খসে পড়েছে, দেয়াল খসে পড়েছে। তারই ভিতর ঘরে-ঘরে মরা মানুষ।

কী আশ্চর্য! মরা তো নয়, জ্যান্ত মানুষ। মরা হলে কবে পচে খসে যেত জ্যান্ত মানুষ ঘুমিয়ে আছে অঘোর ঘুমে!

চার বন্ধু এক-এক করে সব ঘর-দালান ঘুরে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে। ঘরের পর ঘর ঘুরতে ঘুরতে—

মিনু বললে, 'রাজকন্যার ঘরে—'

কেয়া বললে, 'তুমি তো ঠিক ধরতে পার!—রাজকন্যা এক চোখে ঘুমোয় আর এক চোখে জাগে; ঘরের ভিতর চার বন্ধুকে দেখে অবাক! ঘুমের চোখে স্বপ্ন, না জাগার চোখে সত্যি দেখছে ভেবে পায় না।

চার বন্ধু তো অবাক! মণি-মাণিক্যের পালঙ্কে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা এক চোখে চেয়ে আছে—এ আবার কে!

রাজপুত্র এগিয়ে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললে—অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, এমন পুরী তো দেখিনি! কেন তোমাদের এমন দশা?

ঘুমের চোখে স্বপন নয়, জাগার চোখে সত্যি দেখা!

রাজকন্যে চমকে উঠে বললে—সে কথা শুনে কাজ নেই, নাগেশ্বরের পুরী, অজগর পাহারা; এক্ষুনি পালাও, নইলে মারা পড়বে।

চার বন্ধুর তবু জেদ, সব কথা না শুনে তারা যাবে না।

কী আর করে, রাজকন্যা দু-চার কথায় সব বুঝিয়ে দিলে। বলতে বলতে গাল বেয়ে একফোঁটা চোখের জল পড়ল।

চার বন্ধু বললে—কেঁদো না রাজকন্যা! আমরা তোমায় উদ্ধার করব।

রাজকন্যা দুঃখের হাসি হেসে বললে—আর উদ্ধার হবে না। জলের তলায় আগুন জ্বলবে, সে আগুনে শিলা গলবে, তবে আমার উদ্ধার। সে তো হওয়ার নয়!

রাজপুত্র খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভেবে নিয়ে হেসে বললে—এই কথা! এ আবার শক্ত কী! তোমার উদ্ধার হয়ে গেছে তাহলে।

রাজকন্যা বড় দুঃখেও হেসে ফেললে রাজপুত্রের কথায়। রাজপুত্রের কাণ্ড দেখে আরো অবাক।

ঘরে ছিল স্ফটিকের পাত্র। রাজপুত্র তাতে জল ভরল। কোটাল-

পুত্রকে বললে—হাতে করে ধরে রাখ। তারপর শুকনো ঘাস-পাতা কুড়িয়ে আনলে মন্ত্রীপুত্র। সদাগরপুত্র চকমকি ঠুকে স্ফটিক পাত্রের তলায় আগুন জ্বালালে। ঘরে ছিল বাতিদানে মোমের বাতি, রাজপুত্র খুলে নিয়ে সেই আগুনে গলিয়ে ফেললে।

কাণ্ড দেখে রাজকন্যা হেসেই খুন। হাসতে-হাসতে রাজকন্যা উঠে বসল। বসে বললে—এতে যদি শাপ কেটে যেত!

—কেটে যেত কি, গেছে তো!

তাই তো! অবাক কাণ্ড! রাজকন্যা হাসতে হাসতে যে উঠে বসেছে! শুধু কি রাজকন্যা? পুরীর লোকজন সবাই উঠে অবাক!

থম্‌থম্ পুরী আবার গম্‌গম্ করে উঠল। রাজকন্যা পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ রাজকন্যার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। পুরীর চারিধারে হিস্-হিস্, ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ,—হাওয়ায় ভেসে আসে হিমেল নিশ্বাস।

নাগরাজ ক্ষেপে আসছে ছুটে, সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গ।

—পালাও বন্ধুরা, পালাও! রাজকন্যা চেঁচিয়ে উঠল।

—যদি যেতে হয়, তোমায় সঙ্গে না নিয়ে যাব না!

চার বন্ধু রাজকন্যার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। বাইরে চার বন্ধুর ঘোড়া বাঁধা। রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে উঠল নিজের ঘোড়ায়। পিছনে তিন বন্ধু।

ঘোড়া ছুটেছে হাওয়ার বেগে। মাঠ-ঘাট, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে চলেছে চার বন্ধু রাজকন্যাকে নিয়ে।

কিন্তু কত দূর আর যাবে। নাগরাজের মায়ার তো শেষ নেই! তার হাত থেকে কি নিস্তার আছে! দেখতে দেখতে তেপান্তরের মাঝে অকূল নদী জেগে উঠল পথ রুখে।

—ফেরাও ঘোড়া, ফেরাও ঘোড়া!—ফেরাবে কোথায়? পিছনে নাগরাজের চর অনুচর নাগ নাগিনী ছুটে আসছে, সামনে অকূল নদীতে দুরন্ত বান।

—কী হবে রাজপুত্র ?

চার বন্ধু রাজকন্যাকে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

—ভয় নেই রাজকন্যা, তোমায় আমরা রক্ষা করব।

চার বন্ধু রাজকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল। খাপ থেকে তলোয়ার খুলে মাটিতে গেথে রেখে বললে—এই রইল তোমার চিরদিনের পাহারা। মন্ত্রিপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র ও রাজপুত্র নিজের নিজের তলোয়ার খুলে চারিধারে পুঁতে দিলেন।

—নির্ভয়ে থাক রাজকন্যা, এ তলোয়ারের বেড়া ডিঙোবার সাধ্য কারুর নেই।

রাজকন্যা কেঁদে উঠে বললে—কিন্তু তোমাদের কী হবে ?

···আমাদের ? চার বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। মন্ত্রীপুত্র বললে—আমি পবন-মন্ত্র জানি, ঝড় হয়ে বইব। কোটালপুত্র বললে—আমি মেঘমন্ত্র জানি, মেঘ হয়ে আকাশ ছেয়ে দেব। সদাগরপুত্র বললে—আমি বরুণ-মন্ত্র জানি, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ব।

আর রাজপুত্র!

রাজপুত্র বললে—'আমি বিদ্যুৎমন্ত্র জানি, বজ্র হয়ে জ্বলে উঠব। শোন রাজকন্যা, আমাদের একসঙ্গে দেখা না পেলে তুমি মুখ তুলো না।'

মিনু প্রায় চুপি-চুপি বললে, 'তুমিই বুঝি সেই রাজকন্যা ?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই রাজকন্যা ঘুমন্ত-পুরীর। নাগেরা আমায় ঘিরে থাকে, তবু সেই তলোয়ারের বেড়া ডিঙোতে পারে না। চার বন্ধু যেদিন একসঙ্গে দেখা দেয়, সেদিন আমি মুখ তুলে চাই, গন্ধে জানাই মনের কথা।'

কড়্-কড়্-কড়্কড়্। হঠাৎ বাজের শব্দে মিনু চমকে উঠে বসল বিছানায়। ওমা! কোথায় গেল রাজকুমারী ? কেউ যে কোথাও নেই!

কেয়াফুলের গন্ধে ঘর শুধু আমোদ হয়ে গেছে।